ধর্ম ও কৃষ্টি

মূল

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ

মাওলানা লিয়াকত আলী
বি. এ. (অনার্স), এম. এ (সাংবাদিকতা)

সম্পাদনা

শরীফ মুহাম্মাদ ইউসুফ

কাসেমিয়া লাইব্রেরী
মুসলিম বাজার প্রধান সড়ক
১২-ডি, মিরপুর, ঢাকা-১২২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বর্তমান রচনাটি একটি দার্শনিক বিষয়। এটি জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে তাগিদ ও অনুরোধক্রমে লেখা হয়েছিল এবং ১৯৪২ সালে এক সেমিনারে পাঠ করা হয়েছিল। সেমিনারে উক্ত জামেয়ার বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং দিল্লীর আলেম ও সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট রচনাটি খুব প্রশংসিত হয়। ১৯৪৩ সালে এটি 'মাযহাব ও তামাদ্দুন' নামে পুস্তিকা আকারে জামেয়া মিল্লিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান থেকেও এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং দ্রুত শেষ হয়ে যায়। যেহেতু বিষয়বস্তু এখনও আধুনিক এবং যে দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতিতে ধর্ম ও জীবন উভয়টির মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা এখনও শক্তিশালী। সেজন্য 'মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম'–এর পক্ষ থেকে লেখকের পুনঃ পরিমার্জন ও নিরীক্ষণের পর পুস্তিকাখানা প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি অকাট্য দার্শনিক যুক্তি, আলোচনার গাম্ভীর্য ও গভীরতা, ইতিহাস ও দর্শনের ব্যাপক ও গভীর পর্যালোচনা এবং বর্ণনার সাবলীলতা ও হৃদয়গ্রাহিতার কারণে নতুন বিজ্ঞ প্রজন্ম যারা ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা রাখে এবং গাম্ভীর্যের সাথে জানতে চায় ধর্ম জীবনের কি পথ প্রদর্শন করে, সমাজ ও সংস্কৃতির কি মূলভিত্তি ও মূলনীতি দান করে, কোন্ পদ্ধতির ও ধাচের জীবন ও সমাজ বাস্তবায়িত করে, ধর্ম না থাকলে জীবন ও সংস্কৃতির কি কি বিপত্তি দেখা দেয়—তারা আগ্রহের সাথে এটি পাঠ করবে। আশা করি এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় যা মূলতঃ একটি দীর্ঘ বক্তৃতা, বিদ্বান সমাজকে এমন কিছু তত্ত্ব ও ইংগিত দান করবে, যা ধর্ম ও কৃষ্টির অনেক বড় বড় কিতাবেও সহজে পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে চিন্তাশীল, লেখক ও আলোচকদের উপযুক্ত মানসিক আহার ও সঠিক নির্দেশনা মিলবে। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে নতুন মাত্রা যোগ হবে। মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম–এর মৌল উদ্দেশ্যও তা–ই।

সেক্রেটারী, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম

অনুবাদকের আরজ

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহর। দরূদ ও সালাম মহানবী (সঃ)–এর প্রতি। তাঁর আসহাব ও পরিজনের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

মহানবী (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য যে জীবন দর্শন নিয়ে এসেছিলেন তার সাথে মানব রচিত জীবন ব্যবস্থার পার্থক্য কোথায় তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা মুসলিম বিদ্বৎসমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। বিশেষ করে আধুনিক সভ্যতার কেতাদুরস্ত ভূষণের আকর্ষণে মুসলিম যুব মানস যখন বিভ্রান্ত তখন আল্লাহ প্রদত্ত জীবনধারার বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য মতবাদের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু নতুন প্রজন্মের চিন্তার খোরাক যোগাতেই মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর 'মাযহাব ও তমাদ্দুন' গ্রন্থখানি যথেষ্ট সহায়ক হবে বিবেচনা করে আমি এর অনুবাদে হাত দেই। বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। সে হিসেবে অনুবাদে কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচার করবেন বিজ্ঞ পাঠকসমাজ। তবে কোন ভুল–ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনয়াবনত

অনুবাদক

সূচীপত্র

দ্বিতীয় জীবন

ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির সাধারণ প্রশ্ন

কতিপয় প্রশ্ন যে কোন ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টিতে সমভাবে বিদ্যমান। এগুলোর সমাধানের উপরেই সে ধর্ম, দর্শন বা কৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ জগতের শুরু ও শেষ কোথায়? এ জীবনের পরে আর কোন জীবন আছে কি? যদি থাকে, তাহলে তা কোন্ ধরনের এবং তার জন্যে এ জীবনে কি কি করণীয় রয়েছে?

তাছাড়া সৃষ্টিকুল সামগ্রিকভাবে কি? সৃষ্টিকুলকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং একটি সার্বজনীন ও সংহত কানুন মোতাবেক পরিচালনাকারী কে? কি তাঁর গুণাবলী? মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক কি? তাঁর সাথে মানুষের কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত? যে প্রাকৃতিক নিয়ম এ জগতে কার্যকর রয়েছে, তা ব্যতীত কোন নৈতিক বিধান আছে কি? যদি থাকে, তাহলে তার ব্যাখ্যা কি? সৃষ্টিকুলে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান কি? সে কি স্বাধীন না কারো অধীন? দ্বিতীয় কোন শক্তি ও বিচারালয়ের সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে কি না? তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি?

এগুলো প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশ্ন। যে বিধান জীবনের গভীরতার সাথে সম্পর্কিত, যার শিকড় মানুষের অন্তর ও মস্তিস্কে প্রথিত এবং তার শাখাসমূহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত, তা এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। ধর্ম এসব প্রশ্নের সন্দেহাতীত জবাব দেয়ার দাবী করে, দর্শন এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। কৃষ্টি (ব্যাপক ও গভীর অর্থে) এগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ প্রশ্নগুলোর সুনির্দিষ্ট সমাধান ব্যতীত আমরা জীবনের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারি না বা সমাজ ও সংস্কৃতির কোন রূপরেখা প্রস্তুত করতে পারি না। যে কোন সংস্কৃতি, তা যতই স্থূল ও বস্তুগত হোক না কেন, এ প্রশ্নগুলোর সমাধানের কোন না কোন ভাবধারা বহন করে। সে ভাবধারাই উক্ত সংস্কৃতির ভিত্তিরূপে বিদ্যমান থাকে এবং ভিত্তিমূল থেকে

ভবনের দেয়াল ও চূড়া পর্যন্ত সর্বত্র সমানভাবে প্রভাব ফেলে। মানসিকতার এই উৎসমূল থেকে জীবনের সকল স্রোতধারা বিকশিত হয় এবং সেগুলোর গতি নির্ধারিত হয়। জীবন জীবিকা ও সমাজ, নৈতিকতা, রাষ্ট্রনীতি ও আইন, বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যতা ও ভদ্রতা মোটকথা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনের সকল দৃশ্যপটে এ মূলনীতিরই ছাপ পড়ে। আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, কোন জাতি বা সংস্কৃতি উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে অমুক পন্থা অবলম্বন করেছে, তাহলে আপনি সে জাতির জীবনের ছক নিজেই পূরণ করতে পারবেন। তেমনি আপনি যদি কোন জাতির জীবনধারা বা কোন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন যে, সে জাতি বা সংস্কৃতি উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে কোন্ ভাবধারা অবলম্বন করেছে।

এ প্রশ্নগুলো মানুষের সহজাত প্রশ্ন। তাই মানব ইতিহাসের মতই এগুলো প্রাচীন। পৃথিবীর প্রতিটি যুগেই এ প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং তার জবাবও দেয়া হয়েছে। সে জবাবের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন মানবীয় দর্শন, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ইতিহাসে এগুলো পাঠ করি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর উপরিতল ও বাহ্যিক রূপসজ্জা দেখেই আমরা ক্ষান্ত হই এবং মৌলিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করার অবকাশ পাই না। অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সেটির স্বাতন্ত্র্যের কারণ নিয়েও ভাবি না।

এক্ষণে আমাদের দেখতে হবে এসব প্রশ্নের সমাধান লাভের জন্য আমাদের নিকট কি কি উপকরণ রয়েছে এবং এগুলোর কি কি রূপে সমাধান হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রথমত আমাদেরকে নিজেদের শক্তিসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে, যেগুলো দ্বারা এ প্রশ্নগুলোর সমাধানে আমরা সাহায্য লাভ করে থাকি।

সমাধানের উপকরণ ও তার বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা

ইন্দ্রিয়

জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের নিকট স্রষ্টার প্রধান ও সাধারণ দান হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এগুলো দ্বারা আমরা সন্দেহাতীত জ্ঞান লাভ করতে পারি। অনেক দার্শনিক ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান লাভের অস্পষ্ট, অনির্ভরযোগ্য ও দুর্বল মাধ্যম বলে মনে করেন। সপ্তদশ শতকের দার্শনিক নিকোলাস মেলিব্রান্‌স (মৃত্যু ১৭৫১ খৃঃ) সত্যের অন্বেষা (Recherche de la veriter) নামক তাঁর গ্রন্থে লিখেন ঃ

"ভুলের একটি বড় উৎস হলো এই ভুল বিশ্বাস যে, আমাদেরকে নিছক কাজের উদ্দেশ্যে যে ইন্দ্রিয় দান করা হয়েছে, তা বস্তুর মৌলিক অবস্থা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিতে পারে।"

মৌনটেইন (মৃত্যু ১৫৯২ খৃঃ) লিখেছেন ঃ

"মানবীয় জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ—তার ইন্দ্রিয় অনিশ্চিত ও ত্রুটিযুক্ত। আমরা কখনই এরূপ বলতে পারি না যে, ইন্দ্রিয় আমাদের সামনে বস্তুর প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে। ইন্দ্রিয়ের নিকট পৃথিবীটি তেমনই মনে হয়, যেমন তার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে বাইরের জগতের বস্তু নয় ; বরং নিছক ইন্দ্রিয়ের উপকরণসমূহের অবস্থাদি ধরা পড়ে। ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমাদের প্রয়োজন আরেকটি উপকরণের ; যা ইন্দ্রিয়কে সমর্থন বা নাকচ করতে পারে। অতঃপর সে উপকরণটি যাচাই করার জন্য আরেকটি উপকরণের প্রয়োজন হবে। এভাবে সে ধারা অব্যাহত থাকবে।"

(A History of Modern Philosophy vol. 1)

তথাপি যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি না, তাই আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই এ জ্ঞানকে উপলব্ধি করি এবং এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, এর অনেক প্রাকৃতিক নিয়ম ও দৃশ্য জানতে পারি। আমাদের নিকট দৃশ্য, শ্রাব্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের এক বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। তাই উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর প্রতি আমাদের

আরেকবার দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং প্রতিটি প্রশ্নকে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিতে সমাধান করতে হবে।

কিন্তু আমরা কি তা করতে পারি? প্রথম প্রশ্নটিই ধরুন। আমরা কোত্থেকে এলাম এবং কোথায় যাবো? অর্থাৎ এ জগতের শুরু ও শেষ কি? আমাদের চোখ, আমাদের কান, আমাদের স্পর্শশক্তি, আমাদের স্বাদশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি সুস্থ ও সবল থেকেও কি এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোন পথ নির্দেশ করতে পারে? আমরা দেখতে পাই, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল এতটুকু জানতে পারি যে, আমরা এখন কোথায় আছি। আমাদের এ সকল শক্তি তার সামনে ও পিছনে একটি নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে থেমে যায় এবং প্রকৃতি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। আমরা একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে দেখতে পারি না। আমাদের শ্রবণ শক্তিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাজ করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি এ দু'টির তুলনায় আরো সীমিত।

এ জীবনের পরে আর কোন জীবন আছে কি না, আমাদের ইন্দ্রিয় তার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলতে পারে না। কারণ স্বয়ং ইন্দ্রিয় এ জীবনের অধীন এবং জীবনেই তা সীমাবদ্ধ। এর বাইরের কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয় সমর্থন বা বিরোধিতা করতে পারে না। এজন্য পরকালের জীবন সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই বলে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। যা অনুভব করা যায় না, তার অস্তিত্ব কি অস্বীকার করা যায়? অতীন্দ্রিয় অর্থই কি অস্তিত্বহীন? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি আমরা এ নীতি মেনে চলি? আমরা যা অনুভব করতে পারি না, তার অস্তিত্ব কি অস্বীকার করি? নিশ্চয়ই তা করি না। যদি এরূপ হতো ; তাহলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির, সকল ইমারত ধ্বংস হয়ে যেতো।

সুতরাং আমরা যেহেতু পরকালের জীবন সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনরূপ উপলব্ধিই লাভ করতে পারি না। তাই এ সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত কিছু জানার প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—সামগ্রিকভাবে এ জগতের স্বরূপ কি? ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এ প্রশ্নের সমাধান করাও সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা এ জগতের অংশবিশেষ

উপলব্ধি করা যায়। নিঃসন্দেহে এ জগতের অনেক কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় কি এসব বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যকার সম্পর্ক উদঘাটন করতে পারে? গোটা সৃষ্টি সমন্বিত ও সংহত। ইন্দ্রিয় কি তা উপলব্ধি করতে পারে? অতঃপর এ সম্পর্ক ও সমন্বয়ের প্রকৃত কারণ এবং এ জগতের প্রকৃত কেন্দ্র উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রকৃত কেন্দ্র থেকেই জগতের জীবন, শক্তি, আলো, পরস্পর বিরোধী উপাদানের সম্মিলন এবং বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে সংহতি ও শৃংখলা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের মাত্র কিছু অংশ জানতে পারি। কারণ এর অনেক নিদর্শন ও প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। এর অনেক কিছুই আমাদের নিকট স্পষ্ট। আগুন সম্পর্কে আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হলো, তা দহন শক্তির অধিকারী। পানি সম্পর্কে আমরা জানি যে, তা পিপাসা মেটায়। বিষ সম্পর্কে আমরা জানি যে, তা মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকে না। আমরা যেমন স্পর্শ শক্তি দ্বারা আগুনের তাপ অনুভব করি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা তার দহন শক্তি জানি, অত্যাচারের কুফল তেমনটি অনুভব করতে পারি না। এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাস। এ দ্বারা আমাদের যে আন্তরিক অনুভূতি অর্জিত হয়, তা হবে আগুনের তাপ বা হাতের আঘাত থেকে ভিন্ন।

তেমনি মানুষ সম্পর্কে আমাদের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শুধু এই অনুভব করতে পারি যে, মানুষ স্বাধীন। তাকে মানুষ ব্যতীত অন্য কারো বিচারালয়ে জবাবদিহি করতে হবে না, সে কারো নিকট দায়বদ্ধ নয়। মানুষ ও অন্যপ্রাণীর মধ্যে মাত্র এতটুকু পার্থক্যই দেখা যায় যে, মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং একটি উন্নত বিচরণশীল বস্তু। ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হলো, সে জৈবিক চাহিদাগুলো মানবীয় প্রজ্ঞার সাহায্যে যথাসম্ভব অতিমাত্রায় পূরণ করবে।

এ হলো আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া ও স্বাভাবিক ফল। আমি এখনই একথা বলতে চাই না যে, ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে আমরা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উপরেই আমাদের জীবন সৌধ নির্মাণ করি ; তাহলে তা কেমন হবে। তার ভিত্তিমূলে কি কি দুর্বলতা থাকবে এবং তার দেয়ালের কোথায় কোথায় বক্রতা থাকবে।

বুদ্ধিবৃত্তি

অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের যে স্বাতন্ত্র্য, তা তার বুদ্ধিবৃত্তির কারণে। প্রবন্ধের শুরুতে যে প্রশ্নগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আমাদেরকে এখন বিবেচনা করতে হবে, মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানব জীবন ও সৃষ্টিকুলের এ প্রশ্নগুলো সমাধান করা যায় কি না।

আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, বুদ্ধিবৃত্তি একাকী কোন কাজ করতে পারে না। তাকে নিজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বস্তুসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষের অজানা বিষয় পর্যন্ত পৌঁছুতে হলে, তাকে ইতোপূর্বে জানা বিষয়গুলোর সাহায্য নিতে হয়। পূর্বের জানা বিষয়গুলো সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। সকল বুদ্ধিলব্ধ বিষয় বিশ্লেষণ করুন, বুদ্ধিবৃত্তির আকর্ষণীয় ও দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, বাস্তবতার নতুন নতুন জগত পর্যন্ত পৌঁছুতে এবং অজ্ঞানতার বড় বড় সমুদ্র পার হতে একমাত্র বাহন ছিল সেই তুচ্ছ ইন্দ্রিয়লব্ধ ও প্রাথমিক জ্ঞান ; যা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাস ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না।

অতএব, মানুষের ইন্দ্রিয় যেখানে কাজ করতে পারে না, যেখানে তার কাছে জানা কোন বিষয় থাকে না, যার প্রাথমিক বিযয়গুলো সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে, সেখানে তার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ অক্ষম থেকে যায়। মানুষ যেমন নৌকা ব্যতীত সমুদ্র পার হতে পারে না, উড়োজাহাজ ব্যতীত যেমন শূন্যে চলাচল করতে পারে না, তেমনি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সে কোন অজানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি অংকের প্রাথমিক জ্ঞান রাখে না, সংখ্যাগুলোও জানে না, সে স্বাভাবিকভাবে যতই মেধাবী ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, সে গণিত শাস্ত্রের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে পারে না। কোন অস্বাভাবিক মেধাবী ব্যক্তিও জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধসমূহ না জেনে কোন ভূমির পরিমাপ করতে পারেন না। যে ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণমালাই শিখে নাই, সে যতই জ্ঞান ও যুক্তি খাটিয়ে চলুক না কেন, সে ভাষার একটি লাইনও পাঠ করতে পারবে না। কোন ভাষার শব্দমালা যার জানা নেই, সে নিজের স্বাভাবিক মেধা ও যুক্তির বলে সে ভাষার বাক্য বা অনুচ্ছেদ বুঝতে

পারে না। যে কোন বিদ্যা ও বিষয় সম্পর্কেই এ নীতি প্রযোজ্য।

এখন আমরা আবার প্রশ্নগুলোয় ফিরে যাই। প্রশ্নগুলোর সবই অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কিত। জগতের শুরু ও শেষ জীবনের পর মৃত্যু। সৃষ্টিকূল, স্রষ্টা ও জগতনিয়ন্তা, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, নৈতিক বিধান, মানব মর্যাদা—এগুলোর কোনটি সম্পর্কেই আমরা কোন পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রাখি না, এগুলোর প্রাথমিক জ্ঞানও আমাদের পূর্ব থেকে থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। এসব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের মত বুদ্ধিবৃত্তির যৌক্তিক অবস্থান হলো তা একটি নিরপেক্ষ দলের মত নিরব থাকবে। তার এ ক্ষমতা নেই যে, তা নিছক নিজ শক্তির বলে এসব প্রশ্নের সমাধান করবে বা সেগুলো ব্যাখ্যা করবে। তেমনি আইনত তার এ অধিকার নেই যে, তার আয়ত্তের বাইরে হবার কারণে সেগুলো অস্বীকার করবে। একজন অন্ধ ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দেখা ও শোনা বিষয়গুলোকে নিজে না দেখার কারণে অস্বীকার করবে। সে শুধুমাত্র নিজে না দেখার কথা বলতে পারে। তেমনি তার এ অধিকারও নেই যে, সে নিজের দেখা অনুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে। কেননা তার পক্ষে এটি সম্ভব নয়।

কিন্তু মানুষের স্বভাব অতৃপ্ত ও অনুসন্ধিৎসু। কিছুটা স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসু এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির আত্মপ্রবঞ্চার কারণে সে এ সকল প্রশ্নে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে এবং এগুলোর ব্যাখ্যা করে। এই যুক্তির অবতারণা ও বিশ্লেষণের নাম দর্শন।

দর্শন

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে দর্শনশাস্ত্র যেমন ধারাবাহিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে, মানবীয় বিদ্যার কোন বিষয়ই এরূপ আর করেনি। দর্শনের দাবী হলো, এর ভিত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির উপর এবং যুক্তিশাস্ত্রের মূলনীতির উপরই তা প্রতিষ্ঠিত। দর্শন এমন বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে, যার প্রাথমিক দিকগুলোও তার অজানা থাকে এবং মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিরা এ দীর্ঘকাল ধরে এমন লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন, যার চিহ্নও

তাঁরা জানতেন না। আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপ, তাঁর গুণাবলী,গুণাবলীর স্বরূপ ও সত্তার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক, গুণাবলী প্রকাশের ধরন, আল্লাহর ক্রিয়াসমূহ ও তার পদ্ধতি, জগতের স্থায়িত্ব ও নশ্বরতা, মৃত্যুর পরের জীবন এবং অন্যান্য বিশ্বাসগত ও অতিপ্রাকৃত বিষয়সমূহ নিয়ে দর্শন অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে এমন বিস্তারিত ও গভীরভাবে আলোচনা করেছে ; যা একজন তত্ত্বজ্ঞানী নিজ প্রজ্ঞা ও গবেষণার পরে করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—দর্শনের এ সুদীর্ঘ জীবনে সকল প্রকারের মুক্ত সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও খুব কম ব্যক্তিই এর ভুল গতিধারা অনুভব করেছেন এবং এর মৌলিক ভুল বুঝতে পেরেছেন। তেমনি দর্শন শাস্ত্রের এই বৃহৎ গ্রন্থাগারে এমন দার্শনিকের নাম কদাচিত পাওয়া যায় ; যিনি এই কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। যদি কোন শতাব্দীতে দু' একজন ব্যক্তি সোচ্চার হয়ে থাকেন ; তবে তা শত শত ব্যক্তির বক্তব্যের মাঝখানে পড়ে যাবার কারণে স্বতন্ত্র বক্তব্য বলে ধরা পড়েনি। ফলে তাতে দর্শনের গতিধারায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বুদ্ধিবৃত্তির সীমা সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন। দর্শনের এ অসারতার কারণেই তিনি আধ্যাত্মিকতা ও সত্য দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দার্শনিকদের স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞান আলোচনা প্রাকৃতিক ও গাণিতিক বিষয়গুলোর তুলনায় নিছক অনুমানভিত্তিক। এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। তিনি 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

وانهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين

"তারা (দার্শনিকগণ) যে সিদ্ধান্ত দেন, তা কোনরূপ পরীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে দিয়ে থাকেন।"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ গ্রন্থেই দার্শনিকদের 'স্রষ্টা সম্পর্কিত অভিমত ও চিন্তাধারার সমালোচনা' অধ্যায়ে তিনি এই অসারতাকে সমালোচনার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেননি। বরং এর বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা এবং তার যুক্তিসমূহের দুর্বলতার উপরই সমালোচনার ভিত্তি রেখেছেন।

আরবী দর্শনের যুগে দ্বিতীয় যে মনীষী এ সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন, তিনি হলেন ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খৃঃ)। তিনি সংকীর্ণ শাস্ত্রগত পরিভাষায় কোন প্রসিদ্ধ অতি প্রাকৃত দার্শনিক ছিলেন না, তবে তিনি এমন একজন সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন ; যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজ্ঞানময় মস্তিস্ক নিয়ে এসেছিলেন। তার সুস্থ মেধা কোন বক্র ও আনুমানিক বস্তু গ্রহণ করতো না। তিনি তাঁর বিখ্যাত মুকাদ্দামার বিভিন্ন স্থানে এই মূলনীতির ভিত্তিতেই দর্শনের সমালোচনা করেছেন।

তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সীমা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। আশা করি এখানে তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"নিজ মেধার এ দাবীর উপর কখনই বিশ্বাস করবে না যে, তা সৃষ্টিকূল ও সৃষ্টিজগতের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে এবং গোটা সৃষ্টিকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা জানা তার পক্ষে সম্ভব। স্মরণীয়, অস্তিত্বের অর্থ হলো, ব্যক্তির নিকট বস্তুর প্রতিকৃতির উপস্থিতি। সে মনে করে অস্তিত্ব বলতে কেবল এটিই বুঝায়। এর বাইরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। অথচ এটি বাস্তবতার পরিপন্থী। বধির ব্যক্তির নিকট অস্তিত্বশীল জগতের অর্থ, চতুরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যা অনুভব করা যায় কেবল তাই। তার নিকট শ্রাব্য বিষয়সমূহ অস্তিত্বশীল জগতের তালিকা বহির্ভূত। অন্ধ ব্যক্তির নিকট দর্শনযোগ্য কোন বিষয়ই অস্তিত্বশীল জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যদি সমসাময়িক জ্ঞানী ও সাধারণ লোকদের কথার কোন মূল্য না থাকে, তাহলে তারা এসব বস্তুর অস্তিত্বের কথা কখনই স্বীকার করবে না। তারা যদি স্বীকারও করে ; তবে তা তাদের স্বভাবের চাহিদা ও উপলব্ধি ক্ষমতার সাক্ষ্য অনুযায়ী নয়। অবলা জন্তুরা যদি কথা বলতে পারতো এবং তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতো, তাহলে আমরা শুনতে পেতাম যে, তারা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন বিষয় মানতে রাজী নয়। তাদের নিকট এসব বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা আয়ত্ত করার কোন উপকরণ আমাদের নিকট নেই। কারণ, আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতা খুবই সীমিত

ও অস্থায়ী। অথচ আল্লাহর কুদরতের বাইরে কোন কিছু নেই। অতএব, নিজ উপলব্ধি ক্ষমতার ব্যাপকতা ও নিজ আয়ত্তকৃত বিষয়ের সংখ্যা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর দেয়া শরীয়তের শিক্ষার উপর আস্থা রাখা উচিত। কেননা আল্লাহ মানুষের কল্যাণের কথা মানুষের চেয়েও অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন, মানুষের কল্যাণ কিসে নিহিত, তাও তিনিই ভাল জানেন। তাঁর অবস্থানের সাথে মানুষের অবস্থানের কোন তুলনাই হয় না। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি আল্লাহর সামনে কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিবৃত্তির যে কোন মূল্য নেই এমন নয়। বুদ্ধিবৃত্তি একটি সঠিক মানদণ্ড। এর সিদ্ধান্ত সংশয়মুক্ত। এতে কোন মিথ্যার অবকাশ নেই। কিন্তু এ মানদণ্ডে তাওহীদ, আখেরাত, নবুওয়াত, আল্লাহর গুণাবলীর স্বরূপ এবং বুদ্ধি সীমার বাইরের বিষয়গুলো মাপা যায় না। যদি কেউ মাপতে চায়, তাহলে তা হবে নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি স্বর্ণ, রূপা ওজনের দাঁড়িপাল্লায় যদি পাহাড় মাপতে চায়, তাহলে তা সম্ভব হবে না। তবে তাই বলে এতে দাঁড়িপাল্লার বিশুদ্ধতা অপ্রমাণিত হয় না। কেননা তার শক্তির একটি সীমা আছে। তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির কার্যকারিতার একটি পরিসর রয়েছে। সে তার বাইরে যেতে পারে না। কেননা এটি তাঁর সৃষ্টির একটি বিন্দুমাত্র।" (মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন ১২২–১২৩)

উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ) নিজ গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন স্থানে এদিকে ইংগিত করেছেন এবং ইলমুল কালাম–এর বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ইসলামী কালাম শাস্ত্রবিদগণের মৌলিক ভুলসমূহের সমালোচনা করেছেন।

দর্শনের শেষ যুগে যিনি দার্শনিকদের আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং দর্শনের তেলেসমাতির উপর কার্যকর আঘাত করেছেন, তিনি হলেন জার্মানীর ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৯–১৮১৪)। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করেন। তাঁর খাটী বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা (Critic of Pure Reason) (ডঃ ইকবালের ভাষায়) মুক্তচিন্তার ব্যক্তিদের কীর্তিসমূহকে অসার করে দেয়। (খুতবায়ে মাদ্রাজ)

ধর্মীয় দর্শন

এ প্রসঙ্গে ধর্মের সমর্থনের জন্য যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল, যদি তার সমালোচনা না করা হয় ; তবে সুবিচার করা হবে না। বস্তুত এটি কোন দর্শন ছিল না। বিষয়বস্তু, আলোচনা পদ্ধতি, যুক্তিপদ্ধতি, মৌলিক ভাবধারা ইত্যাদিতে উভয়ের মধ্যে চরম পার্থক্য ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও মৌলিক দিক দিয়ে দুই দর্শনের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এতে আল্লাহ্ সংক্রান্ত ও অতি প্রাকৃত বিষয়গুলো নিয়ে দর্শনের মতই ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যদিও দু'টির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী।

মজার ব্যাপার হলো, যখন দর্শনের মোকাবিলায় ধর্মীয় দর্শন আবির্ভূত হয়েছিল এবং তা দর্শনের হাতিয়ার নিয়েই দর্শনের উপর হামলা চালায়, তখন কোন কোন দার্শনিক এ হাতিয়ার দিয়েই তার মোকাবিলা করেন। প্রকৃত পক্ষে এগুলো দার্শনিকদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবার যোগ্য ছিল এবং মোকাবিলার জন্য ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

কিন্তু কালাম শাস্ত্রবিদগণ যুদ্ধের ডামাডোল ও প্রশ্নোত্তরের ঘোরে পড়ে তা ভুলে গিয়েছিলেন। দার্শনিকদের কথার মধ্য দিয়েই মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানোপকরণের অসম্পূর্ণতা বেরিয়ে এসেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো কালাম শাস্ত্রবিদগণ দর্শনের ভাষায় এগুলো শুনেও সচেতন হননি এবং মৌলিক আলোচনা ছেড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দু'দলের মধ্যে বিভিন্ন শাখা–প্রশাখার আলোচনা অব্যাহত ছিল। মোটকথা কতিপয় দার্শনিকের ভাষায় অত্যন্ত নীচু স্বরে হলেও একথা উচ্চারিত হওয়া বড়ই সুলক্ষণ।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) দর্শনের প্রতি আস্থাহীন হবার পর এর বিরুদ্ধে 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ প্রকাশ পেলে দর্শনের মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। তারপরে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আবির্ভূত হন ইবনে রুশদ। তিনি ছিলেন গ্রীক দর্শন বিশেষ করে এরিষ্টটলের চিন্তাধারার বিরাট সমর্থক। তিনি তাঁর দলের পক্ষ থেকে ইমাম গাজ্জালীর গ্রন্থের সমালোচনায় লিখলেন 'তাহাফুতুত তাহাফুত'। এ গ্রন্থের এক স্থানে তিনি ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রতিবাদে লিখেছেন—

وهذا كله عندى تعدا على الشريعة وفحص عما لم تامر به الشريعة لكون قوى البشر مقصرة عن هذا، وذالك ان ليس كل ما سكت عنه الشرع من العلوم يجب ان يحفض عنه ويصرح للجمهور بما ادى اليه النظر انه من عقائد الشرع فانه يتولد عن ذلك مثل هذا التخليط العظيم فينبغى ان يمسك من هذه المعانى كل ما سكت عنه الشرع ويعرف الجمهور ان عقول الناس مقصرة عن الخوض فى هذه الاشياء

"আমার মতে এ সবই (ইমাম গাজ্জালীর সমস্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ) শরীয়তের সীমা লংঘন করে গেছে এবং এতে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা শরীয়ত নির্দেশিত নয়। কেননা মানবীয় শক্তি তা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। শরীয়ত যেসব ব্যাপারে নীরব থেকেছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজ চিন্তা–ভাবনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সাধারণ মানুষের জন্য সেটিকে শরীয়তের বিশ্বাসগত বিষয়ের শামিল মনে করা উচিত নয়। এতে বড়ই অনিষ্ট ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং শরীয়ত যে সব বিষয়ে নীরব রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কোন আলোচনায় না যাওয়া উচিত এবং সাধারণ লোকদের জানিয়ে দেয়া দরকার যে, মানবীয় মেধা এসব বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে না। (তাহাফুতুত তাহাফুত ঃ ১১০)

কালাম শাস্ত্রবিদগণের সমালোচনায় তিনি 'আল কাশফু আন মানাহিজিল আদিল্লাহ্ ফি আকায়িদিল মিল্লাহ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি ইলমে কালাম–এর যুক্তিপদ্ধতির মোকাবিলায় অত্যন্ত শক্তভাবে কুরআনী যুক্তিপদ্ধতির দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। এ থেকে তার সুস্থ চিন্তাধারার নিদর্শন ফুটে উঠে। এতে তিনি বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয় বুঝতে সাধারণ মানুষের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।

আমরা ইবনে রুশদের এ বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি একমত যে, মানবীয় মেধা ও জ্ঞান এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা ও চিন্তা-ভাবনা করতে অপারগ। কিন্তু আমরা দার্শনিকদেরকে মানুষই মনে করি। প্লেটো, এরিষ্টটল, ফারাবী, ইবনে সিনা এবং স্বয়ং ইবনে রুশদ আমাদের মতে মানব সম্প্রদায়েরই সদস্য ছিলেন।

ধর্মীয় দর্শনে সবচেয়ে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ও যুক্তিপূজারী ছিল মু'তাজিলা সম্প্রদায়। এরা আল্লাহকে মানুষের সাথে এবং পরকালকে ইহকালের সাথে পুরোপুরি তুলনা করে মানুষের বিধান ও পার্থিব জীবনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে স্বাধীনভাবে আলোচনা করে এবং জ্ঞানের সীমাকে একেবারেই উপেক্ষা করে। সম্ভবত যে কোন দর্শনের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের অপরিপক্কতা থাকে। সমকালীন একজন দর্শনবেত্তা, নিরপেক্ষ সমালোচক ও ঐতিহাসিক (আহমদ আমীন) যিনি নিজেও মুতাজিলীদের প্রশংসা ও তাদের ইলমী খেদমত স্বীকার করেন, তিনি এ দুর্বলতা সম্পর্কে সততার সাথে এ মন্তব্য করেন ঃ

> "সম্ভবত তাদের দুর্বল দিক হলো, তাঁরা অদৃশ্যজগতকে দৃশ্যমান জগতের সাথে তুলনা করেছেন এবং সেটিকে এ জগতের নিয়ম-কানুনের অধীন সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারকে তেমনই অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন ন্যায়বিচার সম্পর্কে মানুষ যেমনভাবে এবং পার্থিব বিধানে ন্যায়বিচারের যেরূপ সংজ্ঞা রয়েছে। তারা এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন যে, পার্থিব নিয়মেও ন্যায়বিচার একটি আপেক্ষিক বিষয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন আসে। মধ্যযুগে যাকে ন্যায়বিচার বলা হতো, বর্তমানে তা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। পার্থিব নিয়মেরই এ অবস্থা। মানবীয় জগত থেকে ঐশীজগতের প্রতি দৃষ্টি ফেরালে অবস্থা কি দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এরূপে সুন্দর-অসুন্দর, উচিত-অনুচিত, উপযুক্ত-উপযুক্ততর ইত্যাদি বিষয়েও আমরা দেখতে পাই, মানুষের দৃষ্টি যখন সীমাবদ্ধ হয়, তখন কোন একটি বিষয়ে তার যে সিদ্ধান্ত থাকে, দৃষ্টির পরিসর বেড়ে গেলে তা হয় ভিন্নতর।
>
> তেমনি আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার সাথে একীভূত,না পৃথক— এ বিষয়েও তাদের সকল যুক্তি-প্রমাণ অদৃশ্য জগতকে দৃশ্যমান

জগতের সাথে তুলনার উপর নির্ভরশীল। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, ভিন্নতা-অভিন্নতা, স্থানীয়তা-সাময়িকতা, কার্যকরণ ইত্যাদি সকল বস্তুর জন্যই অপরিহার্য। আমার মতে এটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটি মানবীয় বিধান। অথবা আরেকটু সহজভাবে বলতে গেলে আমাদের জগতের বিধান। আমরা দাবী করতে পারি না যে, এ বিধান আমাদের জগতের বাইরেও প্রযোজ্য হবে। অন্যত্র এ বিধান প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সুতরাং মানুষের সাধারণ নিয়ম আল্লাহর বেলায়ও প্রযোজ্য—এ দাবী করা ধৃষ্টতার শামিল। যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সঠিক অনুমান করতে পারে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে, তার পক্ষে এ দাবী করার কোন সুযোগ নেই। এটি শুধু মু'তাজিলীদের দোষ নয়, তাদের পরবর্তীকালের কালাম শাস্ত্রবিদগণেরও দোষ।"

(যুহা'ল ইসলাম ৩খ. ৭০)

প্রত্যক্ষণ

বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের বিরুদ্ধে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিকতার নামে বহুদিন পূর্বে একটি আন্দোলন শুরু হয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও মিসর ছিল এর সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। প্রাচ্যের ধর্মসমূহের প্রভাব ও মিসরীয়দের সাথে সংস্রবের কারণে সীমাতিরিক্ত বুদ্ধিপূজার বিরুদ্ধে গ্রীস ও রোমে স্বাভাবিকভাবেই এটি সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু যে কেন্দ্রে এটি সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করেছিল, তা হলো ইসকান্দ্রিয়া (বর্তমান আলেজান্দ্রিয়া)। এটি ছিল মিসরের অন্তর্গত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মসমূহের সবচেয়ে বড় মিলনস্থল।

এই আন্দোলন ও মতবাদের মূলনীতি হলো—সত্য উপলব্ধির জন্যে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, যুক্তি, অনুসন্ধান, অনুমান, প্রমাণ,ব্যাখ্যা ও সমালোচনার কোন মূল্য নেই ; বরং এগুলো ক্ষতিকর। প্রকৃত সত্য ও প্রত্যয় অর্জনের জন্যে প্রত্যক্ষণের কোন বিকল্প নেই। অন্তরের আলো, মনের বিশুদ্ধতা এবং অন্তরিন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়। বাহ্যিক চোখ যেমন বাহ্যিক বস্তুসমূহ দেখতে পায়, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয় উপলব্ধি করে আধ্যাত্মিকতা ও অতিপ্রাকৃত

বিষয়সমূহ। এ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হবার শর্ত হলো—বস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহকে ধ্বংস করে দেয়া। এই প্রকৃত ও নিরেট জ্ঞান (প্রত্যক্ষণ) এবং সাধনা, প্রবৃত্তি সংশোধন, ধ্যান ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

বস্তুতঃ দর্শন ও ইলমুল কালাম-এর ক্ষেত্রে যেমন একই প্রাণশক্তি ও মানসিকতা কাজ করে, দর্শন ও প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রেও তা-ই কাজ করে। উভয়েই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় এবং উভয়ের বিশ্বাস, আমরা নিজেরাই চেষ্টা করে তা উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়, দর্শন, প্রত্যক্ষণ—সবকিছুর গন্তব্য একটি। অবশ্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। একটি চলে মাটির উপর দিয়ে, একটি শূন্যে উড়ে এবং অন্যটি মাটির নিচের সুড়ঙ্গ পথে সেখানে পৌছুতে চায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বস্তুতন্ত্রের বাইরের জগতে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের কোন হাত নেই। নিশ্চয়ই মানুষের এমন আন্তরিক শক্তি ও অন্তরিন্দ্রিয় রয়েছে, মানুষ যদি তা জাগাতে ও উন্নত করতে পারে, তাহলে সে জগতের অনেক আশ্চর্য বিষয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ছাড়া এগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

মোটকথা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ব্যতীত একটি অন্তরিন্দ্রিয় রয়েছে এবং এমন একটি জগত রয়েছে, যেখানকার স্বরূপ ও রহস্য উদঘাটন করা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব।

আমরা বলতে চাই, অতিরিক্ত একটি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। বরং এরূপ আরো একাধিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাছাড়া এ জগতের বাইরে অন্য জগতসমূহের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। সেসব জগতের বিষয়াদি উপলব্ধি করতে হলে যথোপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। তবে এটি নিছক মানবীয় ইন্দ্রিয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতই এটি দুর্বল ও সীমাবদ্ধ। মানুষের সকল ক্ষমতা ও জ্ঞানোপকরণের মতই এটিও ভুলের উর্ধ্বে নয়। পরিস্থিতি দ্বারা এটিও প্রভাবিত হতে পারে। এ ইন্দ্রিয়টি সীমিত ও ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত না হওয়ার কোন যুক্তি নেই। একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, এর দ্বারা অনুভূত ও প্রত্যক্ষকৃত বিষয়াদিতে কোন ভুল ও আত্মপ্রবঞ্চনার কোন সুযেগ

নেই। যদি এমনটি হতো, তাহলে এর সিদ্ধান্তসমূহে কোন স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য দেখা যেতো না, তাতে কোন প্রকার সংশয় বা সন্দেহ সৃষ্টি হতো না এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের তুলনায় অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়সমূহের মধ্যে স্ববিরোধিতার পরিমাণ বেশি। প্রত্যক্ষণ ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের জ্ঞান গবেষণায় এত স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়, যার নজির দর্শন ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

উদাহরণস্বরূপ একটি নতুন অতীন্দ্রিয়বাদের কথা উল্লেখ করা যায়। এর প্রবক্তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। নতুন অতীন্দ্রিয়বাদের প্রবর্তক প্লাটিনাস (Plotinus) সমকালীন ধর্মব্যবস্থা ও উপাসনা স্বীকার করতেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার দার্শনিক। তিনি শুধুমাত্র চিন্তা ও ধ্যানের প্রবক্তা ছিলেন। অন্যদিকে তার সুযোগ্য শিষ্য পরফিরি (Porphyry) ছিলেন একজন নীরস সূফী।

প্লাটিনাস মনে করতেন মানুষের আত্মা পশুর মধ্যেও প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু পরফিরি তা স্বীকার করেননি। (Encyclopaedia of Religion and Ethics.)

এ চিন্তাধারার তৃতীয় ব্যক্তি প্রকলাস (Proclus) পুরো মিসরীয় ধর্মপ্রথা ও ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন এবং প্রতিদিন তিন বার সূর্যের উপাসনা করতেন। তাঁর ধর্ম ছিল বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণে। উপরোক্ত তিনজনই ছিলেন প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যয়বাদী।

অতঃপর পরফিরির নেতৃত্বে এই নব্য অতীন্দ্রিয়বাদই খৃষ্টবাদের বিরোধিতা করেছিল, জুলিয়ানের (Jullian) সময়ে রোমান পৌত্তলিকতা ও প্রাচীন ধর্মমত পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে জুলিয়ানের সহযোগী হয়েছিল এবং পৌত্তলিকতা ও প্রাচীন অংশীবাদী (Paganism) ধর্মমতকে সহায়তা করেছিল। তখনকার প্রত্যক্ষণবাদীদের স্বচ্ছ চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি তাদেরকে এই অযৌক্তিক তৎপরতা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বরং Encyclopaedia of Religion and Ethics-এর প্রাবন্ধিকের ভাষায়—নব্য প্রত্যক্ষণবাদ প্রাচীন ধর্মমতের নিমজ্জমান জাহাজের কাছে নিজেদের ভাগ্য সমর্পণ করেছিল।

প্রত্যক্ষণবাদী ধর্মসমূহ

উল্লেখ্য, প্রত্যাদেশ ও ওহীতে অবিশ্বাসী ধর্মসমূহ এবং প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে প্রায় একই প্রাণশক্তি ও মানসিকতা কার্যকর ছিল। এ ধরনের ধর্মসমূহের প্রবণতা ছিল আধ্যাত্মবাদীদের মতই প্রবৃত্তিসমূহের দমন, বৈরাগ্য ও একাকিত্ব এবং একমাত্র স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হওয়া। আধ্যাত্মবাদ ও প্রত্যক্ষণের মতই এসব ধর্ম ও সত্য উপলব্ধির জন্যে সাধনা, প্রবৃত্তি দমন, ধ্যান ও চিন্তা–ভাবনার উপরই নির্ভর করে। সম্ভবতঃ এমন গভীর সাদৃশ্যের কারণেই রোমান শাসকদের খৃষ্টবাদে দীক্ষা নেয়ার পূর্বে খৃষ্টবাদের ক্রমবর্ধমান সমাদরের মোকাবেলা করার জন্যে প্রত্যক্ষণবাদীরা রোমান পৌত্তলিকদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রত্যক্ষণ ও ভারতীয় ধর্মসমূহের চিন্তাধারার সাদৃশ্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে উপনিষদ সংকলকদের উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করার জন্যে এমন একটি কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করা, যাতে ধ্যানের চরম উপকরণটি সেই প্রকৃত সত্তার সাথে একীভূত হতে পারে, যে সত্তা গোটা বিশ্ব জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। যুগি উপনিষদে এই ধারণাটিকে 'তাত তুম আছি' বা 'তুমি তো সে–ই' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ একক আত্মা অবর্ণনীয় সত্য ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে যায়। কেননা শুধুমাত্র এভাবেই জীবনের সেসব অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ; যা স্থান, কাল ও কার্যকারণ বিশিষ্ট এ জগতের বিশেষত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো মরীচিকার মতই। যখন এই আত্মিক আনন্দ অর্জিত হয়, তখন সেটিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক তৃপ্তি বা মুজদান। মুজদান শব্দের আভিধানিক অর্থ নিভে যাওয়া বা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। নিরাময় যদিও বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য কিন্তু এটি উপনিষদের মুক্তিচিন্তা অর্থাৎ 'মোক্ষ' থেকে মোটেই আলাদা নয়।" (History of Religions, London 1964 P. 73)

'এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন' এণ্ড ইথিক্‌স–এর প্রাবন্ধিক এ্যালফিনিষ্টন কলেজ বোম্বাই–এর সংস্কৃতের অধ্যাপক ভি এস ঘাটে বলেন, শংকরাচার্যের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উপনিষদের

অহদাতুল উজুদ বা একক অস্তিত্ব–এর শিক্ষা সংক্রান্ত দর্শনকে 'পুনরুজ্জীবিত করা। অধ্যাপক ঘাটে মনে করেন, শংকরাচার্যের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো তিনি উপনিষদের পরস্পরবিরোধী শিক্ষাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

উপনিষদে একদিকে অহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ব)কে এমন উন্নত বাস্তব বিষয়রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সকল গুণাবলী থেকে মুক্ত এবং যাকে শুধুমাত্র 'গুণ ও বৈশিষ্ট্যহীন' বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। অন্যদিকে বহু উপাস্যের ধারণাকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হেতু কারণের এ সর্বোচ্চ উপাদানটি সকল গুণে গুণান্বিত এবং অভ্যন্তরীণভাবে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থার উপর পরিব্যাপ্ত ও ক্রিয়াশীল।

একত্ব ও বহুত্বের এ পরস্পরবিরোধী ধারণার মাঝে সমন্বয় সাধন কিভাবে সম্ভব হলো এবং তার ফল কি দাঁড়ালো তা আমাদের নিকট প্রশ্নই রয়ে যায়।

শংকরাচার্য 'মায়া'–এর মূলনীতি ব্যবহার করে 'পরিচয়' ও 'মুক্তি' অর্থাৎ 'মোক্ষ'–কে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দান করেন, যা উঁচু ও নিচু স্তরে 'ব্রহ্ম'–এর ধারণার সাথে একীভূত ছিল। উঁচু স্তরে 'পরিচয়'–এর অর্থ ব্রহ্ম একটি সাধারণ একক। তিনি ব্যতীত আর কারো অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে নিম্নস্তরে ব্রহ্ম সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর প্রকৃত স্রষ্টা ও নিয়ন্তার আকার ধারণ করেন। তখন তাকে বলা হয় ঈশ্বর। উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সাথে পরিচয় লাভ হয়। তেমনি শংকরাচার্য একই সময়ে কর্ম ও বাহ্যিক আকারের অর্চনার সমালোচনার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য দেবদেবী ও তাদের প্রতিকৃতির উপাসনাকেও বৈধ বলে ঘোষণা করেন। কেননা শংকরাচার্যের মতে, সাধারণ লোকেরা অসীম অপরিমেয় উঁচু অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করতে পারে না। কারণ তিনি অপরিবর্তনীয় ও গুণাবলীশূন্য। তাই তাদের জন্য মূর্তিপূজার বাহ্যিক প্রথা আলামত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

নিঃসন্দেহে বিভিন্নমুখী ধারণার মাঝে সমন্বয় সাধন শংকরাচার্যের কীর্তি বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সমন্বয় শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণ ও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই সম্ভব। কেননা আধ্যাত্মিক দিব্যজ্ঞানে একই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য, মুসলমান সূফীদের নিকটেও প্রত্যক্ষণ ও অন্তর্জ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব

লাভ করে। তাদের নিকটেও সত্যদর্শন ও প্রত্যয় লাভের জন্য অন্তর্জ্ঞানের প্রচেষ্টা ও প্রবণতা দেখা যায়। অথচ মুসলিম সূফীদের জন্য সত্যদর্শন ও প্রত্যয় লাভের একমাত্র মাধ্যম মহানবী (সঃ)–এর পবিত্র সত্তা ও তার শিক্ষা। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিঃ/১২৪০ খৃঃ) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল—

ويجل الله سبحانه ان يعرفه العقل بنظره وفكره و ينبغي للعاقل ان يخلي قلبه ان الفكر اذا اراد معرفة الله من حيث المشاهدة

فارفع الهمة في ان لا تأخذ علما الا منه سبحانه على الكشف فان عند المحققين ان لا فاعل الا الله فاذن لا يأخذ الا عن الله لكن كشفا لا عقلا وما فاز اهل الهمة الا بالوصول الى عين اليقين انفة بقاء مع علم اليقين .

“বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব, জ্ঞানী যদি প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে চায়, তাহলে তার নিজ অন্তরকে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। .... শুধুমাত্র অন্তর্জ্ঞানের দ্বারাই ইলম হাসিলের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হও। কেননা প্রকৃত জ্ঞানীগণ কেবলমাত্র আল্লাহ্ থেকে জ্ঞানলাভ করেন। কিন্তু তা হতে হবে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা। নিছক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তা অর্জিত হতে পারে না। শুধুমাত্র এই আইনুল ইয়াকীন (বস্তু প্রত্যয়)–এর স্তরে উপনীত হবার কারণেই আল্লাহ্ প্রেমিকরা সফল হয়ে থাকেন। তাদের সংকল্প ও চেতনা ইলমুল ইয়াকীন (জ্ঞান প্রত্যয়) লাভ করে সন্তুষ্ট থাকে না।”

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তার 'আল মুনকেযু মিনাদ দালাল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সত্য ও প্রত্যয় অন্বেষার দীর্ঘযাত্রায় তিনি যে স্তরে উপনীত হয়ে স্বস্থি লাভ করেছিলেন ; তা হলো, আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষণ ও আইনুল

ইয়াকীন (বস্তু প্রত্যয়) অর্জন। তিনি লিখেছেন ঃ

واعلم انه هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين فى العلم

اعنى انهم ادركوه بمشاهدة من الباطن ومشاهدة الباطن

اقوى واجل من مشاهدة الابصار وترقوا فيه عن حد

التقليد الى الاستبصار

"জেনে রেখো সত্যিকারের জ্ঞানীদের নিকট প্রকৃত সত্য ছিল তাদের আন্তরিক প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ প্রত্যয়। চর্মচক্ষুর দর্শনের চেয়ে আন্তরিক প্রত্যক্ষণ অনেক বেশী শক্তিশালী ও উন্নত। তারা এ প্রত্যয় অর্জনে অনুসৃতির গণ্ডি পেরিয়ে সাধনার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন।" (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কিতাবুন্নবুওয়াত থেকে উদ্ধৃত)

মুসলমান সুফীদের কাশফ ও আন্তরিক প্রত্যক্ষণের মধ্যেও ভুলের সম্ভাবনা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।* একজন সুফী অপর সুফীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তার কাশফকে অবাস্তব বলে মন্তব্য করেন ; কখনো বা সেটিকে নেশা ও অবচেতনার ফল বলে গণ্য করেন, আবার কখনো বলেন, এটি একটি অস্থায়ী ও প্রাথমিক স্তর। সত্যপন্থী এ পথ মাড়িয়ে অগ্রসর হয়। উঁচু স্তরে উপনীত হবার পর তার নিকট প্রথম স্তরের কাশফ ও প্রত্যক্ষণ ভিন্নতর মনে হয়।

---

* ডঃ রাধাকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপাসনা ও আচারাদি পালনের ধর্মসমূহের তুলনায় প্রত্যক্ষণ ও অতীন্দ্রিয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও এ সত্য স্বীকার করেন যে, মানবীয় আত্মার মৌলিক ও অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যের অর্থ এনয় যে, প্রত্যক্ষণ ও অন্তর্দর্শনও একই হবে। তাদের অন্তর্দর্শনে বিভিন্নতা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক পুরুষদের মধ্যে উপনিষদ, ভগবদগীতা, শংকরা, রামায়ন, রামকৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও জালালউদ্দিন রুমীর কাশ্ফ ও অন্তর্দর্শনের মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য রয়েছে। তেমনি পাশ্চাত্যে প্লাটো, পল, প্রকলাস, টলার, প্লাটিনাস, এখারট–এর চিন্তাদর্শনেও পার্থক্য ও বৈপরিত্য রয়েছে। এ পার্থক্য ঋতু বা ভৌগোলিক অবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরং একই বংশোদ্ভূত ও একই সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও বক্তব্য দিতে দেখা যায়। (Eastern Religion and Western Thought, Oxford University Press, London, 1940)

কাশফ ও প্রত্যক্ষণপন্থী সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মর্যাদা সম্পর্কে আলিম শ্রেণী অবগত আছেন। তার সম্পর্কে এ বিষয়ের অপর মনীষী হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী নিজ মাকতুবাত শরীফে লিখেছেন ঃ

“আশ্চর্যের বিষয় শায়খ মুহিউদ্দীন দেখছি আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অন্তর্গত। অথচ তার জ্ঞানের অধিকাংশ হক পন্থীদের মতের বিপরীত এবং দৃশ্যতঃ ভুল।...... তার অধিকাংশ কাশফ ও কারামত আহলে সুন্নাত এর ইলম থেকে ভিন্নতর এবং ভুল।” (মাকতুবাত ১খ. ২৬৬)

‘অহদাতুল ওজুদ’ বিষয়ে ইবনুল আরাবী ও মুজাদ্দেদে আলফে ছানীর মতপার্থক্য সর্বজন বিদিত। উভয় মনীষীর সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত কাশফ–এর উপর প্রতিষ্ঠিত। মুজাদ্দেদ (রহঃ) নিজ শায়খ খাজা বাকী বিল্লাহ (রহঃ) এবং নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, তারা উভয়েই প্রথম দিকে এ স্তরে ছিলেন যে, তাদের উপর তাওহীদে উজুদী (অস্তিত্বের একত্ব)–এর প্রভাব ছিল এবং কাশফের বাক্য ও স্বতঃসিদ্ধ দলিলসমূহ দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবাণীতে তারা যখন এ স্তর অতিক্রম করলেন তখন তারা তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন—

> “আমার শায়খ হযরত খাজা (কুঃছিঃ) এক সময় ‘তাওহীদে উজুদী’–এর মত পোষণ করতেন এবং চিঠি পত্রাদিতে তা প্রকাশ করতেন। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে সে স্তর থেকে উন্নতি দান করে তাকে মারেফাতের রাজপথে নিয়ে আসেন এবং এ সংকীর্ণ মারেফাত থেকে তাকে মুক্তি দেন। তার জনৈক শিষ্য মিয়াঁ আবদুল হক বর্ণনা করেন, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি বলেছিলেন, ইতিপূর্বে আমি এ বিশ্বাস লাভ করেছিলাম যে, তাওহীদ একটি সংকীর্ণ গলি, রাজপথ অন্যটি। পূর্বে আমি এটিই বিশ্বাস করতাম। বর্তমানে আমার বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছে।.........
>
> এ অধমও কিছুদিন হযরত শায়খের তাওহীদের ধারণা পোষণ করতো এবং কাশফের বাক্যাবলী এর সমর্থনে খুবই প্রকাশ পেতো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাকে সে স্তর অতিক্রম করিয়ে তার পছন্দনীয় স্তরে উন্নীত করেছেন।” (মাকতুবাত ১খ. ৪৩)

বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভুলের সম্ভাবনার কথা তিনি জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে এক পত্রে লিখেছেন—

" প্রশ্ন ঃ নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৃত্তি মৌলিকভাবে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। পরিশুদ্ধি ও সংশোধনের পর আল্লাহর একক সত্তার সাথে বুদ্ধিবৃত্তি এমন সম্পর্ক ও নৈকট্য লাভ করতে পারে না কেন, যাতে সরাসরি আল্লাহ্ থেকে শরীয়তের বিধান জেনে নিতে পারে? তাহলে তো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পাঠানোর প্রয়োজন থাকতো না।"

এ বক্তব্য পুরোপুরি প্রত্যক্ষণবাদের ভাষ্য ও বিবরণ। যিনি এ গলি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন এবং পরিশুদ্ধি ও সংশোধনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার ভাষায়ই এর জবাব শুনুন ঃ

"নিশ্চয়ই বুদ্ধিবৃত্তি সে সম্পর্ক ও নৈকট্য লাভ করতে পারে। কিন্তু এ জগতের সাথে তার পূর্বের সম্পর্ক পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় না। সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় না। তাই সে সর্বদা সংশয়ে ভোগে, সে ধারণা ও কল্পনা অতিক্রম করতে পারে না, ক্রোধ ও প্রবৃত্তি সর্বদা তার সাথী থাকে। ইতর লোভ-লালসা তাকে ঘিরে রাখে। মানবজাতির বৈশিষ্ট্যে ভুলত্রুটি তার সদা সাথী থাকে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি কখনই নির্ভরযোগ্য নয় এবং তার দ্বারা লব্ধ বিধান সংশয়ের প্রভাব ও কল্পনা থেকে সংরক্ষিত থাকে না। বিস্মৃতি ও ভুলের সম্ভাবনা সেখানে থেকেই যায়। পক্ষান্তরে ফেরেশতা এসব বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং এসব হীন প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। তাই অগত্যা তার উপরই নির্ভর করতে হয়। তার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধান সন্দেহ, বিস্মৃতি ও ভুলের সম্ভাবনা থেকে সংরক্ষিত থাকে। অনেক সময় অনুভব করা যায় যে, আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা বর্ণনা করার সময় সন্দেহ, ধারণা বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত কোন কোন সর্বস্বীকৃত মিথ্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তা পৃথক করার কোন সুযোগ থাকে না। পরবর্তীকালে কখনো কখনো পার্থক্য করা যায়। আবার কখনো বা তা সম্ভব হয় না। সুতরাং সে বিধানগুলোর সাথে এগুলোর

সংমিশ্রনের ফলে তা অসত্যরূপ ধারণ করে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।" (মাকতুবাত ১খ. ২৬৬)

প্রকৃতপক্ষে হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ) যেমন বলেছেন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বা আধ্যাত্মিক সব শক্তিই তার ইন্দ্রিয় ও বহির্জগতের বস্তুসমূহের প্রভাব থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে না। তার পরিবেশ, চিন্তা, বিশ্বাস এবং তার নিজের বা গোষ্ঠীর নিকট স্বীকৃত অনুসিদ্ধান্তসমূহ তার প্রত্যক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। এ কারণেই প্রত্যক্ষণবাদীরা নিজেদের অন্তর্জ্ঞান ও প্রত্যক্ষণে প্রচুর পরিমাণে গ্রীক ও মিসরীয় ধ্যান-ধারণার সমর্থন দেখতে পেতো। অন্যদিকে প্রত্যক্ষণবাদীদের নিকট গ্রীক দর্শনের অনেক অনুসিদ্ধান্ত বাস্তব বলে ধরা পড়তো। তারা বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করতেন এবং প্রথম বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কখনো কখনো তাদের কথাবার্তা ও করমর্দন হতো।

তদুপরি এ ইন্দ্রিয়ের শক্তি পুরোপুরি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত বিষয়সমূহ কি? এর দ্বারা আত্মাজগতের রহস্য ও বিস্ময়সমূহ উপলব্ধি করা যায় এবং মানুষ সেজগতের প্রশস্ত আকাশপথে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করে। একটি নতুন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একটি নতুন জগত তার নিকট উন্মোচিত হয় এবং তার কিছু কিছু রূপ ও বর্ণ প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি জগতের ব্যাপকতা অনুমান করতে পারে। কিন্তু হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর ভাষায় এ সবই খেল-তামাশার শামিল। তিনি বলেন—

"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি ও আলো কোন দিক দিয়েই কম নয়। সুতরাং তা পরিত্যাগ করে গায়েবী আকৃতি ও আলোর আকাংখা করার প্রয়োজন নেই। উভয় শ্রেণীর আকৃতি ও আলোই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর প্রস্তার নিদর্শন। দৃশ্যমান জগতের সূর্য ও চন্দ্রের আলো রূপক জগতের চন্দ্র-সূর্যের আলোর চেয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নতমানের। কিন্তু যেহেতু এ দৃশ্য সার্বক্ষণিক এবং সকল শ্রেণীর মানুষ এ ব্যাপারে সমান, তাই তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না এবং গায়েবী জগতের আলো ও আকৃতির আকাংখা আসে। প্রবাদ আছে—

آب کہ رو پیش درت تیرہ نماید

সামনের পানি লোনা মনে হয়।" (মাকতুবাত ১খ. ২০৯)

এই প্রত্যক্ষণ, অন্তরালোক, অন্তর্জ্ঞান ও অন্তরলব্ধ বিষয়াদি দ্বারা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় প্রশ্নসমূহের সমাধান হতে পারে না। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের মতই প্রত্যক্ষণও এ ব্যাপারে অপারগ থেকে যায়। বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের আওতার মধ্যে যেমন স্রষ্টার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান এবং নীতি ও কর্মের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আসতে পারে না, তেমনি এগুলো প্রত্যক্ষণের ক্ষমতারও বাইরেই থাকে। এ কারণেই প্রত্যক্ষণবাদী ভাবধারা সমকালীন কোন না কোন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকেছে। কোন স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত ধর্ম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

মুসলিম মনীষীগণের মধ্যে কাশফ—এর জগতে শায়খ ইবুনল আরাবীর উচু মর্যদা সকলের নিকট স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও তিনি বাহ্যিক ভাবধারা পোষণ করতেন। তার সুন্নত অনুসরণ ও শরীয়ত পালনের কথা কারো অজানা নয়।

আমি মৌলিক প্রশ্নগুলো নিশ্চিত রূপে সমাধান করার সর্বশেষ উৎসটি আলোচনা করবো। আমার মতে সেটি হলো অহী বা প্রত্যাদেশ। এর মাধ্যমকে বলা হয় নবুওয়াত ও রিসালাত। নবুওয়াত ও রিসালাতের আনুগত্য এবং এর শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে যে জীবন পদ্ধতির রূপরেখা পাওয়া যায় আমি তাও বর্ণনা করবো। কিন্তু এসবের পূর্বে আমার মনে হয় নিছক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষণের উপর ভিত্তি করে যেসব কৃষ্টি ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বের তিনটি প্রধান কৃষ্টি ও জীবন ব্যবস্থা

ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টি

বিশ্বের একটি প্রাচীন ও সমাদৃত কৃষ্টি হলো ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্টি। মানুষের জন্য এর মত সহজ ও সাধারণ ভিত্তি, অধিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, সহজে সর্বকালে সস্থানে কার্যকর এবং মানুষের চাহিদা পূরণকারী দ্বিতীয় কোন জীবন ব্যবস্থা নেই। এতে কোন গভীরতা, কোন বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি এবং কোন ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাই সাধারণ মানুষের নিকট এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক পৌনঃপুনিক জয়লাভকারী কোন জীবন ব্যবস্থা দেখা যায় না।

ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

(১) যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, এমন কোন বিষয়ই স্বীকার করা যায় না। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা যা স্বীকৃত হয় না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ মূলনীতি থেকে যে অনিবার্য ফল বেরিয়ে আসে, তা হলো কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা ও শক্তির প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি না হওয়া। যদি তার প্রতি বিশ্বাসই সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাকে মেনে চলা, তাকে ভয় পাওয়া বা তার নিকট কোন প্রত্যাশা রাখার প্রশ্নই ওঠে না। অংশীবাদী প্রভাব ও ধ্যান-ধারণার কারণে এতে যদি একাধিক উপাস্যের বিশ্বাসও যুক্ত হয়, তাহলে তার মন, মস্তিস্ক ও কর্মজীবনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং তাতে এ কৃষ্টির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, জীবনের ইন্দ্রিয় প্রবণতা এবং নীতি ও কর্মের বাস্তব ভিত্তিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য যদি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয় যার অস্তিত্ব অনুভব করে না, তা বিশ্বাস করার বা মানব জীবনে তা মেনে চলার কোন অবকাশ থাকতে পারে না। সুতরাং এ ইন্দ্রিয়যুক্তির তর্কবিদ্যাসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—এ জীবনের পর দ্বিতীয় কোন জীবনের এবং এ জগতের বাইরে অন্য কোন জগতের কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ তা ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে হয় এবং তা মানতে হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ব্যতীত অতিরিক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। পরজীবনে অবিশ্বাসের অনিবার্য ফল হল— এ জীবনই

চরম লক্ষ্য। পরবর্তীকালে কোন হিসাব-নিকাশের ভয় নেই। মানব প্রকৃতিতে এমন স্বাধীনতা ও লাগামহীনতা সৃষ্টি হয়, যাতে কোন অস্থায়ী আইনগত বন্ধন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। ইন্দ্রিয় পরকাল অস্বীকার করলেও জীবনের সমাপ্তির কথা বিশ্বাস না করে পারে না। এ বিষয়টি ইন্দ্রিয়ের অনস্বীকার্য ও পৌনঃপুনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষ করা হয়। তাই পরকালে অবিশ্বাস ও মৃত্যুর স্বীকার থেকে স্বাভাবিক ফল দাঁড়ায়—এ জীবনের পূর্ণ ফল ভোগ করা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ লাভ করার জন্য শারীরিক ও মানসিক চাহিদা সৃষ্টি করা। এ যুক্তি পদ্ধতি ও পদবিন্যাসের যৌক্তিক ও সঠিক ফল এটিই।

এই ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির প্রাথমিক যুগে (কখনো কখনো উন্নত যুগেও) কর্মের প্রেরণারূপে নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না, বরং উদ্দেশ্য, সুবিধা ও ব্যক্তিগত স্বার্থই সেখানে কাজ করতো। সামষ্টিক জীবনের কারণে এ কৃষ্টি যখন উন্নতি লাভ করে, তখন তাতে নৈতিকতা শব্দটিও উচ্চারিত হয়। কিন্তু তার ভিত্তি হয় ভোগবাদী দর্শন। অর্থাৎ নৈতিকতার মাপকাঠি হলো, তা দ্বারা জীবনের স্বাদ ভোগ করার উপায় হয় কি না। আরেকটু উন্নতি লাভ করলে ভোগবাদিতার পরিবর্তে কল্যাণ সাধন হয় তার ভিত্তি। অর্থাৎ নৈতিকতার মাপকাঠি হলো, তা দ্বারা অধিক সংখ্যক মানুষকে উপকার করা যায় কি-না। কিন্তু এ উপকারের মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সাধারণত ইন্দ্রিয় নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভোগবাদী মনোভাব কাজ করে।

(২) এই বস্তুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির দ্বিতীয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য (প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথম বৈশিষ্ট্যেরই পরিশিষ্ট) হলো, বাস্তব জীবনে বাকীর পরিবর্তে নগদ এবং বিলম্বের পরিবর্তে তাৎক্ষণিকতাকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা এটিই ইন্দ্রিয়ের অধিক নিকটবর্তী এবং এতে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাই এ কৃষ্টি বা জীবন বিধানের সকল ধারা ও পর্বে এক বিশেষ ধরনের স্থূলতা ও বাহ্যিকতা এবং গোটা জীবন ব্যবস্থায় সুবিধাবাদী মনোভাব, স্বার্থপরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রিয়াশীল থাকে।

এই বস্তুবাদী মনোভাব ও জীবনাচারের নিশ্চিত ফল হলো—এতে মূলনীতি, নৈতিকতা ও বিশ্বাসের চেয়ে সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রধান প্রধান

নীতি, গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস এবং উত্তম নৈতিকতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য প্রতিনিয়ত পরিত্যাগ করার ঘটনা ঘটে। সুতরাং এ মনোভাব ও জীবনাচারের অনুসারী লোকেরা (তারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন এবং যতই ধর্মীয় অনুশাসন পালন করুক না কেন) সব ধরনের ব্যবস্থার সাথেই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকে। তাদের মধ্যে সকল চলমান যন্ত্রের সাথে ফিট হবার আশ্চর্যজনক যোগ্যতা এবং মোমের মত সব ধরনের সাঁচে খাপ খাওয়ার বিস্ময়কর প্রতিভা থাকে। তারা সব ধরনের ব্যবস্থার কর্মী হতে এবং সব পতাকার নীচে থেকে লড়তে পারে। তারা যে কোন উদ্দেশ্যে জীবন দিতে পারে, নিতেও পারে। তবে শর্ত হলো তাতে তাদের কোন না কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে হবে। তার পরিমাণ যতই কম হোক না কেন এবং তা নিছক কল্পিত ও অস্পষ্ট হলেও কোন ক্ষতি নেই। এই দর্শন কখনো কখনো ব্যক্তিগত দর্শনের সীমা অতিক্রম করে জাতীয় দর্শনের রূপ ধারণ করে। উভয় অবস্থায় নিজের জন্য ও জাতির জন্য তার একটিই শ্লোগান থাকে—

تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اور ع

"বাতাস যেদিকে চলে সেদিকেই চলো।" এবং

زمانہ با تو نہ سازد تو با زمانہ بساز

"যুগ তোমার সাথে খাপ খাবে না, তুমিই যুগের সাথে খাপ খেয়ে চলো।"

(৩) এই কৃষ্টি ও ব্যবস্থায় যেহেতু জ্ঞানলাভের একমাত্র উপকরণ থাকে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় যেহেতু মানুষকে 'বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী' ব্যতীত অন্য কিছু বলে সাক্ষ্য দেয় না, তাই তার ইতিহাস ধারার হারানো অংশগুলো জানতে এবং এ জীবনের নিয়ম–নীতি জানার জন্য প্রাণীকূলের শরণাপন্ন হবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এতে মানব জীবনের এমন এক ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয় ; যা মৌল দর্শন ও উদ্দেশ্য সাধনের দিক দিয়ে নিছক জন্তু সুলভ জীবন পদ্ধতি থেকে খুব বেশী তফাত নয়।

আমার বার বার 'ইন্দ্রিয় নির্ভর' ও 'জন্তুসুলভ' শব্দ ব্যবহার করার কারণে

আপনারা এমন ধারণা করবেন না যে, ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির অর্থ হলো একটি যাযাবর জীবন। এতে সভ্যতা ও ভদ্রতার কোন বালাই নেই। প্রকৃতপক্ষে উৎস ও প্রাণশক্তির দিক বিবেচনা করে আমি এটিকে 'ইন্দ্রিয় নির্ভর' নামে আখ্যায়িত করছি। নইলে সভ্যজীবনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত কৃষ্টি। জীবনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও আনন্দায়ক করার দিক দিয়ে বস্তুগত জীবনের বৈচিত্র্য ও উন্নতি এবং এ বিষয়ে সব রকমের গবেষণা ও আবিস্কারের দিক দিয়ে আধ্যাত্মিক কৃষ্টি এবং কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি–এর মোকাবিলা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ কৃষ্টির মত অন্য কোন কৃষ্টিতে এ বিষয়গুলো উপস্থিত নেই। কেননা এর মূল পুঁজি এটিই।

এ কৃষ্টি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। সে তার শিল্পকলার মাধ্যমে পৃথিবীকে কুসুম–কাননে পরিণত করেছে। পাহাড়ের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে এবং পাথরের উপর ফুল ফুটিয়েছে, গৌরবময় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে। ঈর্ষণীয় ইমারতসমূহ নির্মাণ করেছে এবং মানবীয় শিল্প ও মেধার এমন নিদর্শন পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে যে, তা বিজ্ঞানময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি বলে গণ্য হতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে সে বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়জাত ও বস্তুগত সুযোগ–সুবিধা দিয়ে বশ করে রাখে।

প্রাচীন কালে আরব উপদ্বীপে আদ নামে এক জাতি ছিল। তারা ছিল তখনকার দিনে ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুগত কৃষ্টির প্রতিনিধি। তখন তাদের কৃষ্টি ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যেতো। তাদের জীবন ও কর্ম দেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতো যে, তারা স্রষ্টাবিমুখ ও পরকালে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছিল। তারা বিনা প্রয়োজনে নিছক আমোদ–ফূর্তি বা যশ–খ্যাতির জন্য বড় বড় ভবনাদি ও স্মৃতি সৌধসমূহ নির্মাণ করতো। এগুলো দেখে মনে হতো, নির্মাণকারীরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং তারা মনে করে, তারা চিরকাল এ দুনিয়াতেই থাকবে। তাদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা তাদের চেয়ে উন্নত কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতো না। তাদের নবী তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন ঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

"তোমরা কি নিছক খেল–তামাশার জন্য প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক নিদর্শনসমূহ নির্মাণ করছো? তোমরা এমন কীর্তিকলাপ প্রদর্শন করছো, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে এবং তোমরা কোথাও আঘাত করলে নির্দয়ভাবেই করে থাকো।" (শুআরা ঃ ১২৮–১৩০)

তাদের উত্তরসূরী ছামুদ জাতিও পার্থিব জীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলো। এ জীবনের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি ও পরজীবনে অবিশ্বাস থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা অদৃশ্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতো না। তাদের নবী বললেন ঃ

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ۝ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

"এখানে কি তোমাদেরকে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? এখানকার বাগিচা, ঝর্না, ক্ষেত ও নরম খোসাবিশিষ্ট খেজুরের মাঝে? তোমরা যে, বেশ আড়ম্বরের সাথে পাহাড়ের উপর বাড়ি–ঘর নির্মাণ করছো।" (শুআরা ঃ ১৪৬–১৪৯)

ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও বস্তুতন্ত্র এবং স্থূলচিন্তা (এবং এর উন্নত প্রকরণ পৌত্তলিকতা) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইন্দ্রিয় ও বস্তুপূজারী জাতিগুলোর ধর্মবিশ্বাস সাধারণতঃ মূর্তিপূজার আকারে প্রকাশ পায়। যে উপাস্য দৃষ্টিশক্তির অতীত, নিজের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য যার কোন দৈহিক রূপ সামনে উপস্থিত থাকে না, ইন্দ্রিয় পূজারী ও বাহ্যিক বস্তুতে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে তাকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে নিজের এই চাহিদাকে মেটাবার জন্য শীঘ্র মূর্তি নির্মাণ করে নেয় এবং নিজ জীবনের এই আধ্যাত্মিক দিকটিকেও অন্যান্য দিকগুলোর মতই ইন্দ্রিয় নির্ভর করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এমনই এক জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছিলেন। এরা নিজেদের বাস্তব জীবনের অন্যান্য অনুসঙ্গের সাথে মূর্তিপূজায়ও

অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا
تَعْبُدُونَ ○ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ○ قَالَ
هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ○ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ○
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ○ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ
مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ○ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ○ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ○ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ
لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (شعراء، ٦٩-٨٢)

"আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আঃ)—এর বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। তিনি যখন নিজ পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলেন তোমরা কিসের উপাসনা করো? তারা বললো, আমরা মূর্তিসমূহের উপাসনা করি এবং সবসময় তাদের কাছেই বসে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা কি শুনতে পায়? তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে? তারা বললো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা জান কি তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যার উপাসক, তা আমার শত্রু। আমার একমাত্র উপাসক হলেন, জগতের প্রতিপালক। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সুপথ দেখাবেন ; যিনি আমাকে পানাহার যোগান, আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি আমার জীবন মরণের মালিক এবং আমি আশা করি, শেষ বিচারের দিনে তিনি আমার ক্রটিসমূহ ক্ষমা করবেন।" (শুআরা ঃ ৮২—৮৯)

এই ক্রমবর্ধমান বস্তুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয় নির্ভরতা এবং নৈতিকতার মূলনীতির

বিপরীতে প্রবৃত্তি ও তাড়নার অনুসরণের ফলে মানব প্রকৃতি বিকৃত হতে থাকে, সুস্থ অনুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধ অকেজো হতে থাকে এবং মানুষের স্বভাব বিকৃতির ফলে সে জন্তুকুলের চেয়েও নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছে। হযরত লূত (আঃ) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন ; যারা নৈতিক অধঃপতন ও স্বভাব বিকৃতির এ স্তরেই ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُونَ

"তোমরা কি পুরুষের পিছনে দৌড়াও আর তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করছো? তোমরা বরং সীমালংঘনকারী জাতি!" (শুআরা ঃ ১৬৫–১৬৬)

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۝

"তোমরা কি পুরুষদের অনুগমন করো, রাহাজানি করো এবং নিজেদের সভা সমাবেশে অশালীন কাজ কর্ম করো?" (আনকাবূত ঃ ২৯)

সুবিধাবাদী মনোভাব মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এটি বৈধ–অবৈধ ও আইনসম্মত–বেআইনী কাজকর্মের কোন তোয়াক্কা করে না এবং সামষ্টিক সুবিধা ও শৃংখলার বিপরীতে ব্যক্তিগত সুবিধা বিবেচনা করে। এতে যতই কৃষ্টিগত বিপর্যয় ও সমষ্টিগত অকল্যাণ সৃষ্টি হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। ব্যবসায়ে খেয়ানত ও দায়িত্বহীনতা, ওজনে কম–বেশী করা, এই মনোভাব ও দর্শনের নিম্নতম পরাকাষ্ঠা।

মাদায়েনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তাদের নবী তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে আকৃষ্ট করেন ঃ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"তোমরা পূর্ণরূপে মেপে দাও, কম দিও না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো, লোকদেরকে ঠকাবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে না।"

(শুআরা ঃ ১৮১–১৮৩)

মিসর, শাম, ইরাক, ইরান ও গ্রীস নিজ নিজ আধিপত্যের যুগে এ কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। সেখানে এ কৃষ্টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিরাজ করতো। রোমান সভ্যতা ছিল ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও বস্তুতন্ত্রের চরম কীর্তি। এতে ইন্দ্রিয় নির্ভর নীতি ও সমাজ দর্শন, বস্তুবাদী জীবন লক্ষ্য এবং জীবন পদ্ধতি পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এর ধ্যান–ধারণা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা–সংস্কৃতির ভিত্তিসমূহ প্রচণ্ড তুফানের পরেও বহাল ছিল। রোম সাম্রাজ্যের উত্থানের সময় রোমে যে নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিরাজ করতো, ড্রিপার তা এভাবে চিত্রিত করেন ঃ

"সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে রোম সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে গেল। তখন ধর্মীয় ও গঠনমূলক দিক দিয়ে তার নৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের শেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছে। রোমানদের বিলাসিতা ও ভোগলিপ্সার কোন সীমা–সরহদ রইলো না। তাদের নীতি ছিল, জীবনকে ভোগের শৃংখলে পরিণত করাই মানুষের উচিত। পবিত্রতা ও সাধুতা জীবন ভোগের ভোজ টেবিলে একটি লবণপাত্রের মতো, ভারসাম্য হলো জীবনের দীর্ঘতার একটি উপায় মাত্র। তাদের খানার টেবিলে মনিমুক্তা খচিত স্বর্ণ–রৌপ্যের বাসন শোভা পেতো। তাদের চাকরেরা আকর্ষণীয় পোশাক পরে তাদের সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতো। রোমান সুন্দরীরা সতীত্বের শৃংখল মানতো না। তারা আকর্ষণীয় বেশ ধারণ করে যুবরাজদের মনোরঞ্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। আড়ম্বরপূর্ণ গোসলখানা, চাকচিক্যময় বিনোদনকেন্দ্র ও বিস্তৃত খেলার মাঠ ছিল রোমান রাজধানীর দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্তর্গত। তাদের বিনোদনের একটি বিষয় ছিল লড়াই। কখনো কখনো দু'পাহলোয়ান আবার কখনো দু'টি পশুর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়া হতো। তাতে যেকোন একপক্ষ অপর পক্ষের কাছে শুধু হেরে গেলেই চলবে না; বরং তার জীবন সাঙ্গ হলেই দর্শকদের মন

জুড়াতো ; বিশ্ববিজয়ীদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছিল, পূজনীয় কোন বস্তু থাকলে তা হলো শক্তি। কেননা অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধারাবাহিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সৃষ্ট পুঁজি শক্তির দ্বারাই করায়ত্ত করা সম্ভব। ধন–সম্পত্তির অধিকার এবং প্রদেশসমূহের রাজস্ব নির্ণয় হয় শক্তিবলে, যুদ্ধজয়ের ফলে। রোমান শাসকবর্গ হলেন শক্তির প্রতীক। মোটকথা রোমান সভ্যতার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির একটি আলোক রশ্মি; যা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার উপর ফুটে ওঠা বাহ্যিক আবরণের সদৃশ ছিল।" (ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, মাওলানা জাফর আলী খান অনুদিত)

আরবের জাহেলিয়াত যুগ (যা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাবের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়) মানসিকতা, চিন্তা, নৈতিকতা ও সামাজিকতার দিক দিয়ে খাঁটি ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক যুগ ছিল। পরকাল তথা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাদের ধারণা ছিল (এবং তা ছিল ইন্দ্রিয় নির্ভর) আসমান ও যমীনের দু' চাকা এবং রাত–দিনের চক্র আমাদেরকে পিষছে। এছাড়া আমাদের জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন শক্তি নেই। কুরআন তাদের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করছে—

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

"(তারা বলে) দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা মারা যাই ও জীবন লাভ করি। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।"(মুমিনুন ঃ ৩৭)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

"তারা বলেছিলো, দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা মারা যাই ও জীবন ধারণ করিত সময়ই আমাদের একমাত্র জীবন নাশী।"(জাছিয়া ঃ ২৪)

প্রাক ইসলামী যুগের জনৈক কবি (শাদ্দাখ ইবনে ইয়ামুর কিনানী) এ দলীলের উপর ভিত্তি করেই নিজ গোত্রকে অপর গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উত্তেজিত করে যে, তোমরা যেমন চিরকাল বেঁচে থাকবে না, তারাও তেমনি। তাহলে

ভীত হবার কি কারণ থাকতে পারে? তার যুক্তি পদ্ধতি ইন্দ্রিয় নির্ভর মানসিকতা ও চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কবির ভাষায়—

قاتلى القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشل

القوم امثالكم لهم شعر فى الراس لا ينشرون ان قتلوا

"হে খুজায়া গোত্র, তোমরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যুদ্ধে তোমরা ভীত হয়ো না। তারা তো তোমাদেরই মত। তাদেরও মাথায় চুল রয়েছে। নিহত হবার পর তারাও পুনর্জীবন লাভ করবে না।" (হামাসা)

পরকাল অস্বীকারের ফলে জীবনের যে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয়, তা প্রাক ইসলাম যুগেও ছিল। তারা বলতো মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং জীবনের এ কয়টি দিন (যার পরে আর কোন জীবন নেই) তৃষ্ণা ও বঞ্চনায় কাটানোর কি অর্থ থাকতে পারে? ক্ষুধিত হয়ে জীবন দানের চেয়ে তৃপ্ত অবস্থায় মারা যাওয়াই শ্রেয়। প্রাক ইসলামী যুগের জনৈক তরুণ কবি তুরফা ইবনুল আবদাস এ মানসিকতার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে বলেন—

الا ايها الزاجر احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدى

فان كنت لا تستطيع دفع منيتى فدعنى اباد رها بما ملكت يدى

كريم يروى نفسه فى حياته ستعلم ان متنا غدا اينا الصدى

"আমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও জীবনের স্বাদভোগের কারণে যারা আমার সমলোচনা করছো, তোমরা আমাকে চিরকাল জীবিত রাখতে পারবে কি?

তোমরা যদি আমার মৃত্যুকে এড়িয়ে দিতে না পারো, তাহলে আমাকে আমার ধন–সম্পত্তি নিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করতে দাও।

আমার অপরাধটা কি? আমি একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। জীবনে নিজ পিপাসা মেটাতে চাইছি। আগামীতে যখন আমরা মারা যাবো তখন দেখা যাবে কে পিপাসা নিয়ে মারা গেছে।" (সাবয়ামুয়াল্লাকা, তুরফা)

খাঁটি ইন্দ্রিয় নির্ভর ও জাহেলী পরিবেশে জীবনের (ভোগ লিপ্সা থেকে) অপেক্ষাকৃত উন্নত উদ্দেশ্য থাকে নামযশ বা শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন। জাহেলী মস্তিষ্ক এরচেয়ে উন্নত কোন চিন্তার শক্তি রাখে না। তাই উচ্চাভিলাষী কবি

নিজের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করছে—

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى
وجدك لم احفل متى قام عودى

فمنهن سبقى العاذلات بشربة
كميت متى ما تعل بالماء تزبد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب
ببهكنة تحت الخباء المعمد

وكرى اذ نادى المضاف مجنبا
كسيد الغضا نبهته المتورد

"যৌবনের পুঁজি তিনটি বস্তু যদি না থাকতো, তাহলে তোমার নামে শপথ করে বলছি, আমার মৃত্যু কখন আসে তার আমি কোন পরোয়া করতাম না। একটি হলো—সমালোচনাকারিণী মহিলাদেরও পূর্বে আমি একটি মদিরা পেয়ালা উঠিয়ে নেবো, যাতে উপর থেকে পানি ঢেলে দেয়ার কারণে ফেনা ওঠে। আরেকটি হলো প্রতিশোধের একটি দিন তাঁবুর মধ্যে কাটাবো। তৃতীয়টি হলো একজন বিপন্ন মানুষকে মুক্ত করার জন্যে তেজস্বী ঘোড়া চালানো।" (তুরফা)

এসব ধারণার সাথে এক বিশেষ ধরনের জাহেলী দর্শনের সৃষ্টি হয়। কেননা যাযাবরতা ও অসভ্যতার কোন নিম্নতম যুগ ও দর্শন ব্যতীত চলতে পারে না। এ দর্শনে অন্যান্য জাহেলী বিদ্যার মতই স্থূলতা পরিলক্ষিত হয়। স্থূল চিন্তা, অসম যুক্তি এবং নগদকে বাকির উপর প্রাধান্য দেয়া এ দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাক ইসলামী যুগের কবিগণ এসব ধারণা ও মানসিকতার সাথে এ দর্শনও বর্ণনা করেছেন, যা কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত কবি তুরফা বলছেন— "মৃত্যুর পরে সাবধানতা ও অসাবধানতার ফল অভিন্ন। সাবধানী ও অসাবধানী উভয়ের কবর দেখবে

একই রকমের দু'টি মাটির ঢিবি। দু'টিরই উপর পাথরের কয়েকটি খণ্ড রেখে দেয়া হয়েছে।"

কবি যদিও এখানে উদাহরণস্বরূপ কৃপণ ও লোভী এবং একজন অপব্যয়ী ও বিলাসী ব্যক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তথাপি তার চিন্তা এখানেই সীমিত নয়। তিনি বলেন—

ارى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوى فى البطالة مفسد

ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح مصمد

"আমি একজন খুবই কৃপণ ও লোভী এবং একজন প্রতারিত অপব্যয়কারীর কবরে কোন পার্থক্য দেখি না। তোমরা দেখবে দু'টি মাটির ঢিবি ; যার উপর পাথরের গাঁথুনি দেয়া হয়েছে।"

এসব মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জাহেলী সমাজ জীবনের এক বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়জাত নীতি দর্শন পরিলক্ষিত হয়। জাহেলীয়াতের প্রায় প্রতি যুগে (যদি তাতে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে বিলাসিতা ও ভোগলিপ্সা সৃষ্টি না হয়) সাহসিকতা ও বীরত্ব পৌরুষের উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে ও গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। অনর্থক ও অন্যায় ক্ষেত্রেও বীরত্ব প্রদর্শনকে প্রশংসা করা হয়। কোন সৎ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়াই যুদ্ধকে ভাল মনে করা হয়। মাঝে মাঝে এতে এতই বাড়াবাড়ি হয় যে, জাহেলী সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত দিন অতিবাহিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন প্রতিপক্ষ পাওয়া না গেলে নিজেদের মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করে তারা তাদের অভ্যাস জারী রাখে। কাতাম গোত্রের জনৈক কবি নিজ গোত্রের যুদ্ধপ্রিয়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا

"আমরা কখনো কখনো আমাদের মিত্র গোত্র বনু বকরের উপর হামলা করি। কারণ তখন আমরা স্বগোত্র ও মিত্র ব্যতীত কাউকে পাই না।" (হামাসা)

নিছক যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ ও শক্তি প্রদর্শন জাহেলী মানসিকতার পরিচয়। ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টি ও সভ্যতায় এ মানসিকতা প্রায়ই প্রকাশ পায়। জনৈক জাহেলী কবি তার অস্থির মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—

اذا المهرة الشقراء ادرك ظهرها فشب الاله الحرب بين القبائل
واوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطلي غير طائل

"আমার লাল রঙের ছোট ঘোড়াটি যখন বড় হবে এবং আরোহণের উপযোগী হবে তখন স্রষ্টা যেন গোত্রসমূহের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেন। তাহলে আমি ঘোড়া চালানোর নৈপুণ্য দেখাতে পারব।" (হামাসা)

জাহেলী জাতিতে যদিও ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাপি তা কোন শর্ত ও সীমা মেনে চলে না। অর্থাৎ তাতে সত্য–মিথ্যার কোন মাপকাঠি থাকে না। বরং নিছক পক্ষ সমর্থনই সেখানে একমাত্র উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। কোন দিকে এবং কার সাহায্যের জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে তা বিবেচনা করা হয় না। বরং দেখা হয়— কে আহ্বান করছে। জাহেলী মনোভাব এ বাক্যটির সফল প্রতিফলন ঘটায়—

انصر اخاك ظالما او مظلوما

"তোমার ভাই জালেম হোক কিংবা মজলুম হোক,তাকে সাহায্য করো।"*

জনৈক জাহেলী কবি বলেন—

ان انا لم انصر اخي وهو ظالم على القوم لم انصر اخي حين يظلم

"আমার ভাই যখন জালেম থাকে, তখন যদি আমি তাকে সাহায্য না করি তাহলে সে মজলুম হলে তাকে আমি কিভাবে সাহায্য করবো?"

ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টি পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যাপক ও সমাদৃত বলেই এটিকে একটু বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

---

* হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে প্রখ্যাত ভাষাবিদ মুফাযযাল যব্বি'র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন—ইসলামপূর্ব যুগে সর্বপ্রথম এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল জুনদুব ইবনে আনবার। এখানে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য।

বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি

[পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টিরই অপর নাম বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি। কিন্তু যেহেতু এটি বুদ্ধিবৃত্তিক বলে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি আছে, সে জন্যে আমরা পৃথক শিরোনামে এর উপর আলোচনা করছি।]

কৃষ্টি ও সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও আমরা এমন কৃষ্টির সন্ধান লাভ করতে পারিনি, যাকে সঠিক অর্থে খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি নামে আখ্যায়িত করা যায়। এ কৃষ্টির প্রকৃত অর্থ—বুদ্ধিবৃত্তিক কষ্টিপাথরে যাঁচাই না করে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সমর্থন ব্যতীত কোন কিছুই এতে গ্রহণ করা হয় না। এমন কোন কৃষ্টি যদি কোথাও থেকেও থাকে, তাহলে সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুঃসহ হতে বাধ্য। স্বয়ং এ কৃষ্টির পক্ষেও বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। জনৈক পাশ্চাত্য সাহিত্যিক বলেন—

"মানুষ তার জীবন ও কর্মে বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বেশি দিয়ে থাকে।" কৃষ্টি সম্পর্কেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

চিন্তাধারা, বিশ্বাস, অভ্যাস, জীবনধারা, চরিত্র, সভ্যতা কোনটি সম্পর্কে এ দাবী করা সঠিক নয় যে, তা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিই তার মাপকাঠি। এর অধিকাংশই বুদ্ধিবৃত্তির সাথে পরামর্শ ব্যতীত উদ্ভাবিত হয়েছে। অতঃপর সেগুলোর ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তকে হয়ত মূল্য দেয়া হয় না। অথবা বুদ্ধিবৃত্তি সেগুলোকে স্বীকার করে নেয় ও সমর্থন করতে থাকে। গ্রীসের পতিতা ব্যবসাও স্বভাববিরোধী অপরাধসমূহের পক্ষে গ্রীক দর্শন কত সাফাই না গেয়েছে ঃ কত রহস্যই না খুঁজে বের করেছে; নরবলি উৎসবের মত ঘৃণ্য ও পৈশাচিক কর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে রোমান দর্শন কত কসরৎ করেছে, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে জীবিত কন্যা দাফনের প্রথা এবং ভারতের সতীদাহ প্রথার পক্ষে সমকালীন দার্শনিক ও জ্ঞানীরা কি কম ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন? কিন্তু তাতে এসব কাজের স্বরূপ পাল্টে যায়নি এবং সেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি নামে আখ্যায়িত হতে পারেনি।

কৃষ্টি ও সমাজ তো পরের কথা। এগুলোর মূল উপাদানে বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত আরো অনেক কিছুই শামিল রয়েছে। এমনকি বিজ্ঞান-দর্শনও বুদ্ধিবৃত্তির বাইরের উপাদানসমূহ থেকে মুক্ত নয়।

গ্রীক দর্শন মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাতে গ্রীকদের পুরাণ (Mythology) এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, প্লেটো ও এরিষ্টটল সর্বজন স্বীকৃত মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়েও নিজেদের পরিবেশের প্রভাব ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

পৃথিবীর যেসব কৃষ্টিকে প্রাথমিক ও স্থূল দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি বলে মনে হয়, গভীর ও সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখলে তা খাঁটি ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে বেশী প্রতারণা করে ইউরোপের বর্তমান কৃষ্টি। ইউরোপীয়দের জাদুময় প্রচারণার ফলে এটিকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ আধুনিক দর্শনের প্রতিটি ছাত্র জানে, এর ইতিহাস বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও অভিজ্ঞতার বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হয়। এর পরিণতি দাঁড়ায় বুদ্ধিবৃত্তির উপর বস্তুতন্ত্র, আত্মার উপর ইন্দ্রিয় এবং বিশ্বাসের উপর অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত বিজয় লাভ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের সমাজবিজ্ঞানী ও নীতি বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ শুরু করেন। তারা প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন, বস্তুর স্বরূপ যদি পরীক্ষা করা না যায়, বস্তুজগতের যেসব বস্তু মাপা, ওজন করা ও গণনা করা যায় না, যে নীতির উপকারিতা প্রকাশ পায় না তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা ঘোষণা করলেন—সৃষ্টি জগত নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কোন অতি প্রাকৃত ধারণা বা কোন অতিমানবীয় সত্তার অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে এ চিন্তাধারা অগ্রসর হবে না। তারা বস্তু ও তরঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না এবং পরিস্কার ভাষায় বলে দিতেন—এ জগতে কোন নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ক্রিয়াশীল নয়। সৃষ্টিজগতের যান্ত্রিক বিশ্লেষণই যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলো। এছাড়া অন্য সকল বিশ্লেষণ, চিন্তাধারা ও যুক্তি পদ্ধতি অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে সাব্যস্ত হলো। আস্তে আস্তে লাভজনকতা গোটা জীবনে বিস্তৃতি লাভ করলো।

নীতি ও সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা—মোটকথা সব কিছুরই ভিত্তি সাব্যস্ত হয় অভিজ্ঞতা ও লাভজনকতা। জীবনের কোন গোপন অংশ এবং

মন মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতম অংশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারলো না।

নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় সাহিত্যে 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'প্রকৃতি' এ দুটি শব্দের মত অন্য কোন শব্দ এত বেশী ব্যবহৃত হয় না। এ দুটি শব্দের মত ইউরোপের জন্য আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোন শব্দ নেই। কিন্তু শব্দ দুটি বিশ্লেষণ করলে এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন খুঁজে দেখলে প্রমাণিত হবে, বুদ্ধিবৃত্তি বলতে তারা প্রাণীকুলের বুদ্ধিবৃত্তি বুঝাতে চান (যদি এটি সঠিক হয়) যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি ও অভিজ্ঞতার অনুসারী। এ বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে এ দুটি ব্যতীত সকল বিষয় অযৌক্তিক ও অবাস্তব। সপ্তদশ শতকের জনৈক মনীষী ধারণাটি এভাবে প্রকাশ করেন—

> "আমাদের বিজ্ঞানের ফলাফল শুধুমাত্র গণিতের দ্বারাই পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হতে পেরেছে। জ্ঞান হলো অভিজ্ঞতার সারাংশ। সুতরাং তা হচ্ছে যুগের সৃষ্টি। পরীক্ষণের মাধ্যমে যে সব ধারণা সমর্থিত হয় না তা পরিহার্য। কেননা পরীক্ষণই সকল জ্ঞানের মাতা।"
>
> (Leonardo, History of Modern Philosophy P. 165)

তেমনি তারা প্রকৃতি বলতে প্রাণীর প্রকৃতি বুঝিয়ে থাকেন ; যা সকল প্রকারের সূক্ষ্ম অনুভূতি, নৈতিক মানস এবং সুস্থ মন ও সুস্থ জ্ঞান থেকে মুক্ত থাকে। এ প্রকৃতি সকল প্রকারের জবাবদিহিতা ও বাধ্যবাধকতাকে ভয় পায়। এর ফল দাঁড়ায়—মানুষ পানাহার করবে ও স্বাধীন জীবন-যাপন করবে। যেসব বস্তুর বিপরীতে এবং যেসব ক্ষেত্রে এ শব্দটি উচ্চারিত হয়, তা থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায়, এর একমাত্র অর্থ পশুসুলভ প্রকৃতি।

ইন্দ্রিয় নির্ভর কৃষ্টি ও বিজ্ঞানে মানুষ একটি উন্নত প্রাণী বলে সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ইউরোপের রেনেসাঁ ও বিজ্ঞানের যুগে এটি একটি বিস্তারিত ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় রূপ নেয়। গোটা জীবনধারায় এ ভাবধারা শরীরে প্রাণবায়ুর মত বয়ে গেল। নিজ প্রকৃতির নিকটতর হওয়াই মানুষের সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হতে লাগলো।

স্বভাবতই এর ফলে ভোগ ও বিনোদন (enjoyment) হয়ে দাঁড়ালো মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। ইরানী কবি তাঁর কাব্যিক ভাষায় এটি প্রকাশ করেন— "যত পার ফূর্তি কর, জীবন তো নয় আবার।"

জনৈক আরব কবি তাঁর ভাষায় বলেন—

كريم يروى نفسه فى حياته ستعلم ان متنا غدا ايـنا الصدى

"কি দোষ আমার? আমি তো এক উচ্চাভিলাষী, আমি জীবনের পিপাসা মেটাতে চাই। আগামী দিন আমরা মারা গেলেই জানা যাবে কে পিপাসা নিয়ে চলে গেল।"

ভারতীয় কবি জীবনের নশ্বরতার আবরণে এটিকে এভাবে বর্ণনা করেন—

"কুসুম হাস্যোজ্জ্বল সাকী আর বসন্তের অবকাশ, জালেম ভরেছে পিয়ালা, তুমিও তাড়াতাড়ি পূর্ণ কর।"

পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী ও স্পষ্টবাদী প্রবাদ কোন প্রকার উপমা-উদাহরণের তোয়াক্কা না করে বলেছে—

'Eat, drink and be merry.'

এই বস্তুতান্ত্রিক ও স্বার্থবাদী মনোভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। অর্থনীতিতে এটি পুঁজিবাদের রূপ গ্রহণ করলো, রাজনীতিতে তা সাম্রাজ্যবাদ ও পরাশক্তির আকারে প্রকাশ পেল, চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি বিপরীতমুখী ধারার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত ধারাটিকেই পশ্চিমারা গ্রহণ করলো। উদাহরণস্বরূপ ঃ ধর্ম বা চিন্তাধারার সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে জাতিসত্তা, নৃতত্ত্ব বা আবাস ভূমির ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত। ইন্দ্রিয়ের জন্যে এতে অধিক আকর্ষণ রয়েছে। তাই ইউরোপ আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবতাবাদের চেয়ে সীমিত জাতীয়তা এবং গোটা পৃথিবীকে নিজের জন্মভূমি মনে করার চেয়ে সীমিত ভৌগোলিক দেশাত্মবোধকে বেছে নেয়। পাশ্চাত্যে ধর্মের প্রভাব যতই হ্রাস পেতে লাগলো এবং ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব যত বাড়তে লাগলো, জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ ততই তীব্র হতে লাগলো। এ যেন দাড়ির দু'পাল্লা, একটি ঝুঁকলে অন্যটি উঁচু হয়ে যায়।

ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যে 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দটি বেশ আগ্রহের সাথে

ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এরূপ মনে করা সঠিক হবে না যে, এটি একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন এবং আত্মশুদ্ধির কোন ব্যবস্থা। এটি নিছক মানুষের কতিপয় প্রচ্ছন্ন শক্তির লালন ও উন্নয়ন এবং সেগুলোর রহস্য প্রকাশের প্রয়াস। সম্মোহনীবিদ্যার মতই এটি একটি বিজ্ঞান ও শিল্পে পরিণত হয়েছে। নৈতিকতা ও আত্মার উপর এর কোন প্রভাব নেই।

ইউরোপ পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে ধর্মহীন নয়। এর একটি বিরাট অংশ খৃষ্টীয় ধর্ম মতে বিশ্বাসী। রবিবার লোকেরা গীর্জায় সমবেত হয়, খৃষ্টীয় প্রথা ও পর্বসমূহ সারাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়ে থাকে। এছাড়া ধর্মের অনেক অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের একমাত্র ধর্ম বস্তুপূজা।

জনৈক সত্যদর্শী ইউরোপীয় নও–মুসলিম (মুহাম্মদ আসাদ) ইউরোপের বর্তমান জীবনধারা ও বস্তুপূজা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

'ইউরোপের একজন মধ্যবিত্ত, সে গণতন্ত্রী হোক বা ফ্যাসিষ্ট পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক শিল্পকর্মী ও হস্তশিল্পী বা চিন্তাবিদ যাই হোক না কেন সে শুধু একটি বাস্তববাদী ধর্মের কথাই জানে। বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির পূজা এবং এই বিশ্বাস যে, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনকে সবসময় স্বাচ্ছন্দ্য দান করা (এবং আধুনিক ভাষায়) প্রকৃতি থেকে মুক্তিদান করা। এ ধর্মের উপাসনালয় হচ্ছে বিশাল কারখানা, সিনেমা, প্রেক্ষাগৃহ,নাচঘর ও বিদ্যুৎ কারখানা। এ ধর্মের পুরোহিত হচ্ছেন ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার,চিত্র তারকা, ব্যবসায়ী ও রেকর্ড স্থাপনকারী প্রতারক। শক্তি ও আনন্দের এ প্রান্তিকতার অনিবার্য ফল হলো পরস্পরে শত্রু হওয়া। যখনই তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, এরা মারণাস্ত্র নিয়ে একে অপরকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত থাকে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার ফল দাঁড়ায়, মানুষের পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়া, যার নৈতিকতা কার্যত উপকারিতার মধ্যে সীমিত। এতে ভালমন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হলো বস্তুবাদী সাফল্য। পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবনে যে গভীর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তাতে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের

উপর যেসব সৌন্দর্য সরাসরি প্রভাব ফেলে যেমন—শিল্পযোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, দলীয় স্বার্থ চিন্তা—এগুলো বেড়ে যেতে থাকে এবং এগুলোর মূল্যায়নে কখনো কখনো অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়। এগুলোর বিপরীতে যেসব সৌন্দর্য শুধুমাত্র নৈতিক দিক দিয়ে মূল্যবান ছিল যেমন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা বা দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করা, তার গুরুত্ব দ্রুত কমে যেতে থাকে। কেননা এগুলো সমাজের কোন প্রকাশ্য উপকার দান করতে পারে না। যে যুগে পারিবারিক সম্পর্ক গভীর করাকেই পরিবার ও গোত্রের কল্যাণের জন্যে জরুরী মনে করা হতো, তার পরিবর্তে পাশ্চাত্যে এসেছে আধুনিক যুগ যেখানে ব্যাপক অর্থবোধক শিরোনামের অধীনে সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চলে। যে সমাজ মৌলিকভাবে শিল্প নির্ভর, যার শৃংখলা অত্যন্ত দ্রুত খাঁটি যান্ত্রিক সীমারেখার মধ্যে আনা হচ্ছে, সমাজ তার সদস্যদের জন্যে পারস্পরিক আচরণের জন্যে যে নীতিমাল প্রণয়ন করে দিয়েছে তা মেনে না চললে একজন পিতার সাথে তার সন্তানের আচরণের কোন গুরুত্ব নেই। এর ফলে ইউরোপীয় পিতা নিজ সন্তানের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলছেন এবং সন্তানের অন্তর থেকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাতাপিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এক যান্ত্রিক সমাজের দ্বারা এসব সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এতে মানুষের পারস্পরিক হক বাতিল করে দেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এর অনিবার্য ফল হয় পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট পরস্পরের হক নষ্ট হয়ে যেতে থাকা।" (Islam at the Cross Roads)

প্রত্যক্ষণবাদী কৃষ্টি

'প্রত্যক্ষণ' হলো ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও বস্তুতন্ত্রের পুরোপুরি উল্টো। ইন্দ্রিয় নির্ভরতায় যেমন আত্মা ও এ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অস্বীকার করা হয় বা এগুলোকে উপেক্ষা করা হয়, 'প্রত্যক্ষণে' তেমনি শরীর ও বস্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়। এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হলো, মানুষের শরীর একটি খাঁচা বিশেষ,

এতে আত্মা হলো বন্দি পাখী। এই খাঁচাটি তার সকল প্রকারের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে বাধাস্বরূপ। আত্মা তার মূল কেন্দ্র ও স্বকীয় ধারার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে তাকে এ খাঁচা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই এটিকে হয় ভেঙ্গে ফেলতে হবে অথবা তার বন্ধনকে দুর্বল করে দিতে হবে, যাতে প্রাণপাখি ইচ্ছা করলেই উড়ে যেতে পারে।

আধুনিক প্রত্যক্ষণবাদের দ্বিতীয় প্রবক্তা পরিফিরি বলেন, দর্শনের লক্ষ্য হলো মৃত্যুলাভ ও মৃত্যুর নৈকট্য। কেননা এর দ্বারা আত্মা ও শরীরের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয় ; যা জীবনের মৌল লক্ষ্য।

এ মতবাদের অন্য প্রবক্তারা বলেন—

"মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো আনন্দ ও ভোগলিপ্সা। কেননা এরই কারণে আত্মা ও শরীরের সম্পর্ক বহাল থাকে, এরই কারণে আত্মার ঐশী উপাদান নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং আত্মা তার স্বকীয় ধারা পরিহার করে শরীরের নির্দেশিত পথে চলতে থাকে। বহিরিন্দ্রীয়কে নির্জীব করে দেবার পর শুধুমাত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতেই দর্শন হাসিল হতে পারে। শরীর আত্মাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। সুতরাং আত্মা যতক্ষণ বস্তুগত বন্দী খানায় আবদ্ধ থাকবে, আমরা ততক্ষণ প্রকৃত সত্য লাভ করতে পারবো না।"

এই প্রত্যক্ষণবাদী দর্শন ও শিক্ষার প্রভাব যেসব ধর্ম ও নীতিদর্শনের উপর পড়েছে, সেগুলোতে শরীরের কৃচ্ছ্র সাধন, বস্তুবাদের নিছক মূলোৎপাটন, মানব প্রবৃত্তিসমূহের পুরোপুরি দমন, উদ্দীপনা অবদমন এবং সংসার বিমুখতা ও বৈরাগ্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হয়, দৈহিকতা ও আধ্যাত্মিকতা পরস্পর বিরোধী। এ দু'টি কখনও একত্রিত হতে পারে না। আত্মার মোকাবেলায় শরীরকে পরাজিত ও উপেক্ষিত করতে পারাই মানুষের সৌভাগ্য।

এ দর্শনের ফলে শরীর এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদির প্রতি শুধু অবহেলা প্রদর্শনই করা হয় না ; বরং তার বিপরীতে এক বৈরী উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। একজন পথিক যদি কোন পাথরের খণ্ডে বারবার আঘাত পায় বা একটি মুক্ত

বিহঙ্গ খাঁচায় আটকে পড়ে, তাহলে পথিকের মনে পাথর খণ্ডের প্রতি এবং পাখির মনে খাঁচার প্রতি যেরূপ বৈরী উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, শরীরের প্রতি সৃষ্ট উদ্দীপনাও ঠিক সেরূপ। তখন সে দুনিয়াকে অশান্তির স্থান, জীবনকে একটি ভারী বোঝা এবং পার্থিব সম্পর্কসমূহকে শিকল ও বেড়ি মনে করে। স্পষ্টতঃই এসব ধারণা কৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করে। এদ্বারা কোন কৃষ্টির কেবল ধ্বংস সাধনই সহজ হয়, বিনির্মাণ হতে পারে না। ইন্দ্রিয় নির্ভরতা ও খাঁটি আধ্যাত্মিকতা দুই মেরুতে অবস্থিত। এ দুয়ের মধ্যে একটি বড় তফাৎ হলো, ইন্দ্রিয় নির্ভরতা পৃথিবীতে নিজ মূলনীতির উপর সহজেই একটি কৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু খাঁটি আধ্যাত্মিক দর্শনের উপর সীমিত আয়তনের ভূমিতেও কোন কৃষ্টিয় জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

এ কারণেই প্রত্যক্ষণবাদ গ্রহণকারীরা ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষণবাদী ও আধ্যাত্মিক মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে বস্তুতান্ত্রিক ও ইন্দ্রিয় নির্ভর মূলনীতি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে। তাদেরকে নিজেদের জীবনে বস্তুতন্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হয়। তারা তাদের উপাসনালয়গুলোতে ছিল প্রত্যক্ষণবাদী ও আধ্যাত্মিক। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে তারা পুরোপুরি বস্তুবাদী ও ইন্দ্রিয় নির্ভর ছিল।

অশোক ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ আবার একই সাথ বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি ও সফল বিজয়ী। তিনি ছিলেন এই কর্ম পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নমুনা। কনস্তান্তিন যখন খৃষ্টধর্ম (যা তার বাহকদের দ্বারা বিকৃত হয়ে একটি খাঁটি আধ্যাত্মিক ও প্রত্যক্ষণবাদী শিক্ষায় পরিণত হয়েছিল) গ্রহণ করেন তখন তিনিও এই দ্বৈতনীতি অবলম্বন করেন এবং খৃষ্টবাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে পৌত্তলিক রোমের বস্তুবাদ ও জাহেলিয়াতকে একত্রিত করেন।

কিন্তু সর্বদা এরূপ হতো না। বরং যখন খাঁটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা কোন কৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলার সুযোগ পায়, কৃষ্টি তখন ধ্বংস হতে থাকে এবং জাতি ও সভ্যতা আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তখন সে জাতি ও সভ্যতা হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নইলে সে জাতির মধ্যে প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা থাকলে সে খাঁটি আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। কিন্তু পরিণামে তা সাধারণতঃ বস্তুবাদে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আধ্যাত্মিকতার

কোন আকৃতির সাথেই সমঝোতা বা সহনশীলতাকে সে স্বীকার করে না। ইউরোপে শেষোক্ত অবস্থাটিই দেখা দেয়। এখানে প্রথমতঃ প্রত্যক্ষণবাদের প্রভাব এবং দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টধর্মের বাহকদের ভ্রান্ত ধারণা, ধর্মের স্বরূপের সাথে অপরিচিতি ও বিকৃতি সাধনের কারণে কিছুদিনের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রত্যক্ষণবাদের চেয়েও বেশি বৈরাগী ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহকে গুরুতর পাপ, নারী জাতিকে দুনিয়ার জন্য অভিশাপ এবং তাদের সাথে সম্পর্ককে ধর্মীয় উন্নতির পথে বাধারূপে বিশ্বাস করা ধর্মের মৌলনীতির শামিল হয়। খৃষ্টধর্মের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ্যে সংসার বিমুখতা ও বৈরাগ্যজীবনের পক্ষে প্রচারণা চালান। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ পাদ্রী ও পণ্ডিতগণ শিশুদেরকে মায়ের কোল থেকে বের করে বন-জঙ্গলে পাঠাতে এবং যুবকদেরকে ফুসলিয়ে বৈরাগী বানানোর গর্বিত কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

শরীর পাতন, কৃচ্ছসাধন ও অস্বাভাবিক সাধনার যে ভয়ংকর ঘটনাবলী এবং পাদ্রীদের হিংস্র পশুদের গুহা, শুকনো কুয়া ও গোরস্থানে বসবাস করার, শরীরের বড় বড় পশম দ্বারা আচ্ছাদনের প্রয়োজন মেটানো, চতুষ্পদ জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলা, মানুষের খাদ্যের পরিবর্তে ঘাস খাওয়া এবং সারা বছর এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার যেসব ঘটনাবলী 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন, তা থেকে ভারসাম্যহীনতার কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়। বিকৃত খৃষ্টধর্মই মানবতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে এ ভারসাম্যহীনতা সাধন করেছিল।

এই অমানবিক ও দুঃসহ আধ্যাত্মিক দর্শনের ফল দাঁড়ালো এই যে, যেসব স্থানে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য ও ধর্মের প্রভাব ছিল ; সেসব জায়গায় কৃষ্টির ভিত্তি নড়ে গেল। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে লাগলো। রোগ, মহামারী ও খরার আধিক্য দেখা দিলো। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হতে চললো। নাগরিকত্বের নিদর্শন দূর হলো, জীবনোপকরণ রয়ে গেল নামমাত্র এবং গোটা খৃষ্টজগতে অশিক্ষা, অসভ্যতা ও অন্ধকারের যুগ শুরু হয়ে গেলো। ফলতঃ 'মধ্যযুগ' ও 'অন্ধযুগ' সমার্থক হয়ে দাঁড়ালো।

এমত পরিস্থিতিতে একটি প্রতিবাদের ঝড় উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। হলোও তাই। উনবিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্য যখন শেষ

পরাজয়ের শিকার হলো, একজন ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন খাবারের প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে, ইউরোপও তখন বস্তুবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লো। এ বস্তুবাদ ছিল কয়েক শতাব্দীব্যাপী মানবতা ও কৃষ্টির উপর খৃষ্টীয় পাদ্রী ও পুরোহিতদের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ। কিন্তু এ ছিল মানবতার উপর আরেকটি অত্যাচার। তবে এ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর যে, দু' অত্যাচারের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মারাত্মক এবং কোন্‌টিতে মানবতাকে অধিক অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তেমনি এ ভবিষ্যদ্বাণী করাও কঠিন যে, এই পশুসুলভ ; বরং হিংস্র বস্তুবাদ ও এই যান্ত্রিক জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কবে উদ্ভাবিত হবে এবং এ ধারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্নসমূহ সমাধানের দ্বিতীয় উপায়

রিসালাত

এ যাবত যে দীর্ঘ আলোচনা-বিশ্লেষণে আপনাদের সময় ব্যয় করানো হলো, তার সারকথা—মানুষের যাবতীয় বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত শক্তি তার ইন্দ্রিয়, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্তরিন্দ্রিয়, তার অন্তদর্শন—এসব তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে অপারগ থেকে যায়। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ যখনই তার এসব শক্তি বলে প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে চেয়েছে তখনই সে বিফল হয়েছে। আনুমানিক ও সন্দেহজনক সমাধানের উপর ভিত্তি করে মানুষ যখন নিজ জীবনধারা ও কৃষ্টির কোন ইমারত নির্মাণ করেছে, তখন তার ভিত্তিতে এমন বক্রতা সৃষ্টি হয়েছে যে, তা আকাশচুম্বী হলেও বক্রই থেকে গেছে।

কিন্তু আমরা কি এই নেতিবাচক সিদ্ধান্তের উপর তুষ্ট থাকতে পারি? আমরা কি ধরে নেবো মূলতঃ এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই?

আমরা যখন সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এর ব্যাপকতা, বিরাটত্ব, নৈপুণ্য, রহস্য, এর সার্বজনীন নিয়ম, এর উপাদানসমূহের ভারসাম্য, এর অংশসমূহের সংগতি এবং সেগুলোর পারস্পরিক সমঝোতা পর্যবেক্ষণ করি—তখন আমাদের সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি এটি মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না যে, এ কারখানা কোন নির্মাতা ব্যতিরেকেই নির্মিত হয়েছে। কোন নিয়ন্ত্রক ব্যতিরেকেই এটি পরিচালিত হচ্ছে, এর পিছনে কোন লক্ষ্য–উদ্দেশ্য নেই এবং এমনিতেই নিজে নিজে শেষ হয়ে যাবে। মানুষের জন্য দুনিয়াতে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে মানুষের প্রতি পদক্ষেপের জন্য যে নিয়ম রয়েছে, ভূ–পৃষ্ঠে মানুষের কেন্দ্রিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা, মানব জীবনের গোপনীয় প্রয়োজনগুলো মেটাতেও যে প্রতুল সামগ্রী বিদ্যমান রয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও স্তরের জন্য যে পথ নির্দেশনা রয়েছে, এসব যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের বিবেক, একথা স্বীকারই করতে চায় না যে, মানব জীবন অনর্থক। জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের চেয়ে মানুষের মর্যাদা বেশী নয়। তার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলোর সমাধানের জন্যে কোন পথ নির্দেশনার ব্যবস্থা

নেই এবং তার আধ্যাত্মিক দিকটি পরিপূর্ণ করার কোন উপকরণ নেই।

অতঃপর সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, তা এককভাবে নয় ; বরং সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ। তার অংশসমূহ পরস্পরে মিলিত হয়ে এটি সৃষ্টি করে। এটি সব দিকদিয়ে পরিপূর্ণ। এর কোন একটি অংশের বিকল্প সম্ভব নয়। মানবীয় ব্যবস্থাপনাও এই সমঝোতা ও কর্মবন্টন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমরা মানসিক দিক দিয়ে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, একদিকে আমরা এসব প্রশ্নের সমাধান করতে নিজেদের অপারগতার কথা স্বীকার করি। অন্যদিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এসব প্রশ্নের সমাধানে আমাদের জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে আমরা বলি না, প্রতিটি মানুষ পথ–প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত। কেননা এটি স্রষ্টার নিয়ম ও জগত প্রকৃতির পরিপন্থী।

আম্বিয়ায়ে কেরাম

এ পর্যায়ে আমাদের সামনে এমন কিছু ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যাঁরা দাবি করেন, তাঁরা স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের সমাধানে আমাদের পথ–প্রদর্শন করতে পারেন। তাঁরা বলেন, সৃষ্টিকর্তা এ জগতের অনেক রহস্য আমাদের নিকট উদ্ভাসিত করেছেন এবং আমাদের নিকট এক নতুন জগত (অদৃশ্য জগত) উন্মোচিত করেছেন। তোমরা এ দৃশ্যমান জগতকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করো স্রষ্টা চাইলে আমরাও সে জগতকে (অদৃশ্য জগত)[১] তেমনই প্রত্যক্ষ করি। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও পছন্দ–অপছন্দের বিষয় এবং বিধিবিধান সম্পর্কে আমাদেরকে সরাসরি জানিয়েছেন। আমাদেরকে তোমাদের জন্য মাধ্যম বানিয়েছেন এবং আমাদের উপর বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এরা ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম।

এই দাবীদার লোকদের সম্পর্কে আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আরো কিছু বিষয় জানতে পাই ঃ

(১) তাদের নীতি অতি উন্নত, তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ এবং তাদের

১। অদৃশ্য জগতের অর্থ হলো, যে সত্য নিছক ইন্দ্রিয় বা নিরেট বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

জীবন পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত। কোন মামুলি ব্যাপারেও তাদের সম্পর্কে কখনও মিথ্যা ও ভুলের নজীর পাওয়া যায়নি। সাধারণ কোন ব্যাপারেও তাঁরা কাউকে কখনও প্রতারণা করেননি।[২]

(২) তাঁরা পূর্ণ বিবেচনা, সুস্থ মানসিকতা ও সুষ্ঠু প্রকৃতির অধিকারী মানুষ। তারা সকল ক্ষেত্রে সঠিক মতামত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ বোধশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের দ্বারা এমন কোন কিছু ঘটেনি, যাতে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, সাবধানতা ও চিন্তার ভারসাম্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।[৩]

(৩) (তাঁরা দুনিয়ার সকল ব্যাপারে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো ব্যতীত) মধ্যপন্থী মানুষ ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির ব্যক্তি হন। এ ধরনের মানুষেরা সাধারণতঃ

২। নবী নিজ সম্প্রদায়কে বলেন—

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(আমি তোমাদের নিকট কোন নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি নই) ইতিপূর্বে আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় আমি তোমাদের নিকট কাটিয়েছি (তোমরা আমাকে ভালভাবে দেখেশুনে নিয়েছ। আমি কি কখনও মিথ্যা বলেছি? আমি কি তোমাদেরকে কখনও ধোকা দিয়েছি? এখন হঠাৎ করে আমার কি হলো যে, আমি এত বড় মিথ্যা বলব আর তোমাদেরকে ধোকা দেব?) (ইউনুস ঃ ১৬)

৩। "مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (سورة قلم-٢)

"আপনার প্রভুর মেহেরবাণীতে আপনি অপ্রকৃতিস্থ নন।" (কলম ঃ ২)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ (سبا- ٤٦)

"আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি—তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দুইজন করে ও একজন করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকো যে, তোমাদের এই সাথীর কোন উন্মাদনা নেই।" (সাবা ঃ ৪৬)

পার্থিব বিষয়াদি ও জ্ঞানে কোন স্বাতন্ত্র্য, প্রাধান্য ও বিশেষ পারদর্শিতার দাবি করেন না।[৪]

(৪) তাঁরা অদৃশ্য ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এমন জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন ; যা তাঁদের সমকালীন ব্যক্তির জানা থাকতো না।[৫] তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের যুগের গতানুগতিক বিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন।[৬] তাঁরা শাস্ত্র ও বিদ্যার পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করেন না এবং সকল প্রকার কৃত্রিমতা ও ভনিতা থেকে পবিত্র হন।[৭] তত্ত্বজ্ঞানের ঝর্ণাধারা তাদের অন্তরে যেমন

৪। قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (سوره كهف - ١١٠)

"বলুন, আমি তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের সাথে আমার একমাত্র পার্থক্য হলো, অহীর।" (কাহাফ ঃ ১১০)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (سورة يوسف - ١٠٩)

"আপনার পূর্বে আমি জনপদের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট আমি অহী পাঠাতাম।" (ইউসুফ ঃ ১০৯)

৫। تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا (سوره هود - ٤٩)

"এগুলো হচ্ছে অদৃশ্যজগতের সংবাদ, আমি আপনার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। আপনি বা আপনার সম্প্রদায় পূর্বে এগুলো জানতো না।" (হূদ ঃ ৪৯)

৬। وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (سوره عنكبوت - ٤٨)

"ইতিপূর্বে আপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করতেন না, নিজ হাতে তা লিখতেনও না। তাহলে অসৎপন্থীদের সন্দেহের অবকাশ থাকতো।" (আনকাবুত ঃ ৪৮)

৭। وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (سوره ص - ٨٦)

"আমি কৃত্রিমতার সাথে কোন কিছু করি না।" (ছোয়াদ ঃ ৮৬)

উৎসারিত হয়, তেমনি তাদের ভাষায় তা প্রবাহিত হয়।[৮]

(৫) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁরা কোন দাবি করেন না, অন্যেরাও আশা করতে পারতেন না।[৯] তাঁরা নিজেরাও এমন আশা করতে পারতেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁরা এ পদে (নবুওয়াত) সমাসীন হবেন।[১০]

(৬) জীবনের প্রথম থেকেই তারা চরিত্রের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং

৮। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى (سورة نجم ٤-٣)

"তিনি নিজ প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না। এ হচ্ছে নিছক অহী যা তার নিকট পাঠানো হচ্ছে।" (নাজম ঃ ৩-৪)

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ - (سورة يونس)

"বলুন, আমার এ অধিকার নেই যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এতে পরিবর্তন সাধন করব। আমার নিকট অহীর মাধ্যমে যা পাঠানো হয়, আমি কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করি। (ইউনুস ঃ ১৫)

৯। قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ (سورة يونس ١٦-)

"বলুন, আল্লাহ্ চাইলে আমি তোমাদের নিকট এটি পাঠ করে শোনাতাম না এবং তোমাদেরকে তা জানাতাম না। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল অতিবাহিত করেছি (তখন তো আমি কোন দাবী করিনি বা কোন গ্রন্থ পেশ করিনি)।" (ইউনুস ঃ ১৬)

১০। وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - (سورة قصص - ٨٦).

"আপনি নিজেও কখনও আশা করেননি যে, আপনার নিকট কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মেহেরবাণী।" (কাসাস ঃ ৮৬)

নৈতিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদেরই মধ্যে সুস্থ প্রকৃতির নমুনা প্রকাশ পায়।[১১]

(৭) তাঁদের জ্ঞানে কোন পর্যায়ক্রম নেই। সত্য তাঁদের নিকট একসাথে ও পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়। বয়স ও জ্ঞানের বৃদ্ধির কারণে তাঁদের তত্ত্বের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।[১২]

(৮) পণ্ডিতদের নিজ নিজ বিদ্যার বিশুদ্ধতার প্রতি যতখানি আস্থা থাকে, নবীগণ নিজেদের প্রচারিত বিষয়ের প্রতি তার চেয়ে অধিক দৃঢ় আস্থা পোষণ করতেন। এ সকল বিষয় তাদের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভূত বিষয়ের মতই গণ্য হয়ে থাকে। কোন প্রকার সমালোচনা ও বিতর্কের কারণে তাদের মনে সংশয়ের লেশমাত্র সৃষ্টি হয় না।[১৩]

১১। وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ٥

"পূর্বেই আমি ইবরাহীমকে সুষ্ঠু বিবেক দান করেছিলাম। আমি পূর্ব থেকেই তার সম্পর্কে অবহিত ছিলাম।" (আম্বিয়া ঃ ৫১)

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (سورة انعام - ١٢٤)

"আল্লাহ সম্যক অবহিত রয়েছেন পয়গম্বরীর জন্য যে উপযুক্ত।" (আনয়াম ঃ ১২৪)

১২। اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۔ (سورة النساء - ٨٦)

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এতে প্রচুর গড়মিল দেখতে পেতো।" (নিসা ঃ ৮২)

১৩। قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ (سورة يوسف ١٠٨)

"বলুন, এই আমার পথ, আমি সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।" (ইউসুফ ঃ ১০৮)

(৯) তারা কিছু অদৃশ্য বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতিরূপে মেনে নেয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। এ বিষয়গুলো বুদ্ধিবৃত্তির কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা যায় না। কিন্তু অবশিষ্ট বিশ্লেষণ ও বিষয়সমূহ পুরোপুরি যৌক্তিক। তাঁরা তাতে অসংখ্য রহস্য ও কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেন। ইবাদত, নৈতিকতা, আচার–ব্যবহার, পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করেন।[১৪] পৃথিবীর পণ্ডিতবর্গ এর চেয়ে অধিক উত্তম কোন ব্যবস্থা পেশ করতে পারেনি এবং দুনিয়াবাসী এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি।

(১০) যারা তাদের মূলনীতিসমূহ মেনে নিয়ে তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে, তারা সমকালীন লোকদের তুলনায় ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। তাঁদের ন্যায় চরিত্র মাধুর্য, স্বভাবের পবিত্রতা, ব্যাপকতা, ভারসাম্য, খোদাভীরুতা ও সত্যান্বেষা অন্য কোন নৈতিক ও সংস্কারমূলক শিক্ষার অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায় না।[১৫]

(১১) তাঁরা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করেন না। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সব

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي (سوره انعام-٥٧)

"বলুন, আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত দলিলের উপর রয়েছি।" (আনয়াম ঃ ৫৭)

১৪। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (سوره جمعه-٢)

"তিনি (নবী) তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" জুমুয়া ঃ ২)

১৫। এর প্রমাণ নবীদের সহচরবৃন্দের ইতিহাস ও চরিতমালা। শেষনবী (সঃ)এর সহচরবৃন্দের (সাহাবায়ে কেরাম) জীবনেতিহাস পৃথিবীতে সংরক্ষিত রয়েছে। উপরে যেসব গুণের কথা উল্লেখ করা হলো, নবীদের পরে তাদের চেয়ে সুন্দর নমুনা বিশ্বজগত প্রত্যক্ষ করেনি। কুরআন মজীদ এই গুণটিকে তাযকিয়া (পবিত্র করা, সাফ করা) শব্দে বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে— (وَيُزَكِّيهِمْ) নবী তাঁর সাথীদেরকে পবিত্র করেন। (জুমুয়া ঃ ২)

সময় নিজের পক্ষ থেকে দিতে পারেন না;[১৬] বরং প্রত্যাদেশ ও অহীর জন্য সর্বদা অপেক্ষা করেন।[১৭] যে কোন বস্তু যে কোন প্রকারে অর্জন করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। কখনো কখনো তাঁদের মনোভাব, কখনো তাঁদের অনুমান ও কাজের বিপরীতে প্রত্যাদেশ আসে। তাতে তাঁদের প্রতি অনুযোগ করা হয়। উপদেশও দেয়া হয়।[১৮]

(১২) আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁদের বিশেষ সম্পর্কের কথা জানা যায়। তাঁদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন এবং সৃষ্টিকুলের শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার কথা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের সাহায্য এবং কখনো কখনো তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য এমন অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায় ; যা সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। মানবীয় মেধা ও অভিজ্ঞতা আল্লাহর শক্তিমত্তা এবং তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ব্যতীত এসব ঘটনা প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁদের কোন ক্ষমতা থাকে না এবং মানুষের দাবি সত্ত্বেও তাঁরা

১৬। قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ - (انعام ٥٠)

"বলুন, আমি তোমাদের বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। আমি অদৃশ্যের সংবাদও জানি না। আমি এ–ও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তা–ই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহীরূপে আসে। বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?
(আনয়াম ঃ ৫০)

১৭। قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ (سورة البقرة ١٤٤)

"আসমানের দিকে আপনাকে (অহীর আশায়) বার বার তাকাতে দেখি।"
(বাকারা ঃ ১৪৪)

১৮। কুরআন মজীদে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। দেখুন তওবা ঃ ১১৩, আনফাল ঃ ৬৭, তাহরীম ঃ ১।

নিজেদের ইচ্ছামত এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন না।[১৯]

এ হচ্ছে, আম্বিয়ায়ে কেরামের দল এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য। এ–ই তাঁদের দাবির প্রমাণ ও নিদর্শন। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তাঁদের সত্তা ও চরিত্র। এটি একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘ ; বরং শত শত মু'জিজার সমাহার।

তাঁদের এ মু'জিজার (অসাধারণ চরিত্র মাধুর্য) প্রতিই সবচেয়ে বেশী মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে। দ্বিতীয় দলিল তাঁদের শিক্ষা ও গ্রন্থ ; যা চিরসজীব অলৌকিক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। এতে শত প্রকারের শাব্দিক, অর্থগত, মুখ্য, গৌণ, বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত অলৌকিকত্ব বিদ্যমান থাকে।

এখন চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা নিজের একজন বান্দাকে অন্য বান্দাদের নিকট নিজ বার্তা, বাণী ও বিধান পৌছাবার জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তাঁদের নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনা দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—একথা মানতে কোন যৌক্তিক প্রশ্ন থাকতে পারে কি? এতে এমন কি রয়েছে, যা যুক্তির পরিপন্থী? এটি কি আল্লাহর শক্তিমত্তা এবং তাঁর গুণাবলী ও চাহিদার

১৯। وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (سورہ عنکبوت - ٥٠)

"তারা বলে—তাঁর (নবীর) উপর মু'জেযাসমূহ নাযিল করা হলো না কেন? বলুন—সকল নিদর্শন আল্লাহর নিকট। আমি কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (আনকাবূত ঃ ৫০)

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন মু'জেযা প্রকাশ করার অধিকার কোন রসূলের নেই। প্রতিটি সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে। (রা'দ ঃ ৩৮)

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ـ

"তাদের বিমুখ হওয়া যদি আপনার নিকট দুঃসহ হয়ে থাকে, তাহলে আপনি সক্ষম হলে মাটিতে সুড়ঙ্গ বের করে অথবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে তাদের নিকট কোন নিদর্শন (মু'জেযা) নিয়ে আসুন।" (আনয়াম ঃ ৩৫)

পরিপন্থী? কিন্তু এরূপ সুস্পষ্টভাবে নয়। আল্লাহকে সর্বজ্ঞ, সর্বময় শক্তির অধিকারী জেনেও এতে কি প্রশ্ন থেকে যায়। বরং প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীত দিকটিই আল্লাহর গুণাবলী ও তার চাহিদার পরিপন্থী। এত বড় মনুষ্য সমাজকে অনুমান সংশয়ের মধ্যে ছেড়ে দেয়া এবং তাদের পথ–নির্দেশনার কোন ব্যবস্থা না করা আল্লাহর রহমত ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এটি কি আল্লাহর রীতি ও ইতিহাসের সাক্ষ্যের পরিপন্থী? তা–ও সঠিক নয়। বিপুল সংখ্যক আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যুগে ও গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে নবী এসেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন যৌক্তিক দলিল প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁদের দাবির সাথে অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল। কিন্তু তাঁদের বিপরীতে যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল মৌখিক এবং তার সাথে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না।

এটি অতীন্দ্রিয় বা পরীক্ষার অযোগ্যও ছিল না। নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয় ও সাধারণ মানবীয় অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র নবুওয়াতকে প্রমাণ করতে পারতো না। কিন্তু এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা কিছুটা অনুমান করতে পারে। নিজের জ্ঞানের কথা চিন্তা করুন। প্রথমে (শৈশবে বা অজ্ঞতার সময়ে) আমরা তা জানতাম না এবং এর অনেক কিছুই আমাদের পূর্ব পুরুষ ও মুরব্বীদের জানা ছিল না। কিন্তু শিক্ষা ও একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে আমরা তা অর্জন করি। তেমনি আম্বিয়ায়ে কেরাম যথোপযুক্ত পন্থায় নবুওয়াতের জ্ঞান লাভ করেন।

কুরআন মজীদের একটিমাত্র আয়াতে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

'তারা আল্লাহর সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ তারা বলেছিল—আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। বলুন সে কিতাব কে অবতীর্ণ করেছিলেন ; যা মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন মানুষের জন্যে আলো ও হেদায়েত রূপে? তোমরা তা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভক্ত করে কিছুটা প্রকাশ করো আর অনেকটা গোপন রাখো, তোমাদের এমন কিছু জানানো হয়েছে ; যা তোমরা বা তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। বলুন, আল্লাহ (অবতীর্ণ করেছেন)। অতঃপর তাদেরকে অনর্থক আলাপচারিতায় মেতে থাকতে দিন। (আনয়াম ঃ ৯১)

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, যারা রেসালাত ও নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে অবগত নয় এবং তারা আল্লাহর পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রভুত্ব গুণ, দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে এবং মানব জীবনের শুরু থেকে তার প্রতি আল্লাহর রহমত সম্পর্কে চিন্তা করে, সে কখনই রেসালাত অস্বীকার করতে পারে না। কেননা, রিসালাত হলো, আল্লাহর প্রভুত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। তাঁর রহমতের এক অতি পরিপূর্ণ ক্ষেত্র এবং আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

অতঃপর নুবওয়াতের একটি প্রসিদ্ধ নজীর পেশ করা হয়েছে—

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ

"বলুন, মূসা (আঃ) যে কিতাব উপস্থিত করেছিলেন, তা কে অবতীর্ণ করেছিল?"

অতঃপর নবুওয়াতের সম্ভাব্যতার পক্ষে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষণযোগ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তা হলো জ্ঞান। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মানুষের জানার কোন শেষ নাই এবং অজ্ঞতার পরে অবগতি আসতে পারে। সুতরাং নবুওয়াত ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী ও প্রতীকসমূহের ব্যাপারে মূলতঃ কোন প্রশ্ন নেই। অবশ্য যে ব্যক্তি এরূপ উচু স্তরের নয়, সে এটি অনুমান করতে পারে না এবং তারপক্ষে নবীর উপর নির্ভর করা এবং তার অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকে না।

এই স্তরের দিক দিয়ে এবং এর নিদর্শনাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর দিক দিয়ে নবী ও অনবীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে মহানবী (সঃ) একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা বর্ণনা করেছেন। নবীদের বাণীতে এর চেয়ে সুন্দর নবুওয়াতের ব্যাখ্যা এবং অধিক সহজবোধ্য কোন দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।

একদিন মহানবী (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর উঠে আরবের চিরাচরিত পন্থায় আসন্ন শত্রু বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে সাহায্য প্রার্থনার ঢংয়ে চিৎকার করে জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। রীতি অনুযায়ী আরবের লোকেরা নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে সাফার পাদদেশে সমবেত হলো। প্রথমে তিনি বললেন—আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে কেমন দেখতে পেয়েছো? সকলে এক বাক্যে বললো— আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যপন্থী ও বিশ্বস্ত রূপে পেয়েছি। এভাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি প্রকাশ করলেন যে, নবুওয়াতের দাবি করার পূর্বে চরিত্রের পবিত্রতা এবং ব্যাপক সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

নিজের সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে এত বড় স্বীকৃতি আদায়ের পর তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের জানাই যে, পাহাড়ের অপরদিকে শত্রু বাহিনী রয়েছে। তোমাদের উপর অতর্কিতে হামলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? আরববাসী ছিল নিরক্ষর। কিন্তু তাই বলে তারা সাধারণ জ্ঞানবর্জিত ছিল না। এতটুকু মোটা কথা তারা বুঝতে পারতো যে, আমরা পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ের পিছন ও অন্যদিক আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাহাড়ের উপর এমন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ; যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেননি। পাহাড়ের উভয় দিকই তাঁর দৃষ্টির ভিতরে। তিনি যদি পাহাড়ের অপর দিকের কোন সংবাদ জানান, তাহলে তাতে ভুল হবার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। তাই তারা বললো—

"আমরা নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবো। কেননা আপনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তাছাড়া আপনি এখন পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহানবী (সঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে, আল্লাহর আযাব (যা তোমরা দেখছ না) অচিরেই তোমাদের উপর আপতিত হবে।" (বিদায়া নিহায়া)

প্রকৃতপক্ষে এ ছিল নবুওয়াতের একটি দৃষ্টান্ত। এটি বুঝাবার জন্যে তিনি

প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করলেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে যারা উচু স্তরের নয়—নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে পেয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তা না দেখা বা নিজেদের জানা না থাকার কারণে কিংবা নিছক আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা তা অস্বীকার করতে পারে না। এরা শুধুমাত্র নিজেদের দেখা বা জানার ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষায়) নাজানা ও অবিশ্বাস (অর্থাৎ না জানা ও বিশ্বাস করা যে বিষয়টি এরূপ নয়)— এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। জ্ঞান সম্পর্কে বলা যায়, আল্লাহর নবীর বার্তাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যারা নবুওয়াত এবং অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব ও রহস্য অনুধাবনে সক্ষম নয়—এরূপ লোকেরা যখন আল্লাহর নবীর সাথে অন্তর্জ্ঞান ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন তিনি বাধ্য হয়ে বলতে থাকেন—

اَتُحَآجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ

"তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।" (আনয়াম ঃ ৮০)

আল্লাহর নবী যা দেখেন, তা তিনি অন্যদের দেখাতে পারেন না। তাঁর যেমন দৃঢ়বিশ্বাস থাকে, তিনি তা অন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর এই অক্ষমতার কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন—

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ـ

"তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়, দেখো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আলোতে অবস্থান করি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া করেন ; কিন্তু তোমরা তা জানতে পেলে না, তাহলে তোমাদের সম্মতি না থাকলেও কি আমি তোমাদের উপর সেটি চাপিয়ে দেব?" (হূদ ঃ ২৮)

এ ধরনের সাধারণ লোকদের ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ (যা নিজ নিজ অনুভবনীয় বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে) এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি (যা নিজ পরিসরে পুরোপুরি

কার্যকর থাকে) নবুওয়াতী বিষয়সমূহ অনুধাবনে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর ও অক্ষম থাকে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ -

"বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অক্ষম হয়ে পড়েছে, তারা এ বিষয়ে সন্দিহান। বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে।" (নামল ঃ ৬৬)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

"তারা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলোই জানে, পরকাল সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ।" (রূম ঃ ৭)

তারা যদি এ বিষয়ে কোনরূপ উক্তি করে, তবে তাও কোন বিশ্বাস বা অনুধাবনের উপর ভিত্তি করে নয়—তা নিছক তাদের আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"তাদের কিছুই জানা নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। কিন্তু অনুমান কখনও সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না।" (নাজম ঃ ২৮)

আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা

এখন আমরা দেখতে চাইব। নবীগণ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর সৃষ্টিকুল ও সৃষ্টিজগত, এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের স্বরূপ, এর পরিণতি, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তার চরম লক্ষ্য সম্পর্কে কি শিক্ষা দিয়েছেন এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার কোন মূলনীতি দান করেছেন। অতঃপর আমরা দেখবো, এ মূলনীতির ভিত্তিতে মানব জীবনের যে ভবন নির্মিত হয়, তার বৈশিষ্ট্য কি কি?

উল্লেখ্য, দার্শনিক ও প্রত্যক্ষণবাদীদের বিপরীতে এ বিষয়ে নবীগণের শিক্ষা এক ও অভিন্ন। তাঁদের বক্তব্যে কোন তফাৎ নেই। এখানে সমীচীন হতো বিভিন্ন নবীর ছহিফার বক্তব্য ও উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা। কিন্তু অধিকাংশ ছহিফা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অবশিষ্টগুলো সংরক্ষিত না থাকার কারণে (ইতিহাস দ্বারা যেমনটি প্রমাণিত হয়) গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বেশী কিছু উপস্থাপন করা যায় না। তাই আমরা শুধুমাত্র সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআন মজীদের উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করছি। কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সংরক্ষক ও হেফাজতকারী এবং সবগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর কাজ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত উপাসনার উপযোগী অন্য কেউ নেই। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন, অতি দয়ালু করুণাময়। তিনিই আল্লাহ ; যিনি ব্যতীত উপাসনার উপযোগী আর কেউ নেই। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী, হেফাজতকারী, বিক্রমশালী, পরাক্রমশালী, বড়ত্বের অধিকারী। লোকেরা যেসব বস্তুকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী, আকৃতিদানকারী, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে ; তার তাঁ গুণগান করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (হাশর ঃ ২২-২৪)

পৃথিবীর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। সে তার পিছনে ধাওয়া করে চলে এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টি ও বিধান তারই। বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ কল্যাণময়।" (আরাফ ঃ ৫৪)

আল্লাহর আধিপত্য, শক্তিমত্তা ও শাসন

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"বলুন, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রুজি কে দান করেন? যিনি কান ও চোখের মালিক, যিনি মৃত থেকে জীবিত ও জীবিত থেকে মৃতকে উৎসারিত করেন এবং যিনি সব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন ; তিনি নন কি? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?" (ইউনুস ঃ ৩১)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

"বলুন, তোমরা কি জানো পৃথিবী ও এতে যা রয়েছে তা কার? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছো

না কেন? বলুন, সাত আসমানের প্রভু কে? মহান আরশের মালিক–ই বা কে? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ্। আপনি বলুন, তথাপি তোমরা কেন ভয় পাওনা? বলুন, সকল বিষয়ের আধিপত্য কার হাতে এবং তিনি আশ্রয় দেন অথচ তার বিপরীতে কাউকে আশ্রয় দেয়া যায় না? তোমরা জান কি? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। আপনি বলুন, তাহ্লে এটি তোমাদের উপর যাদু হলো কিরূপে? (মুমিনুন ঃ ৮৪–৮৯)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ

"আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহর, চিরস্থায়ী আধিপত্য তার। তবুও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করো।" (নাহল ঃ ৫২)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

"আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত তারা কি অন্য কিছুর সন্ধান করে? অথচ আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর যা কিছু রয়েছে, তা তাঁর প্রতি ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় আনুগত্য পোষণ করে এবং তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।"

(আলে ইমরান ঃ ৮৩)

সৃষ্টিজগত অনর্থক নয়

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

"আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যস্থলে যা রয়েছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি।" (সোয়াদ ঃ ২৭)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ـ

"নিশ্চয়, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত দিনের পালাবদলে জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে নিদর্শনসমূহ। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। (চিন্তা করে তারা বলে উঠে) হে আল্লাহ, তুমি এটি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই।" (আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

মানবজীবন অনর্থক নয়, দুনিয়াতে তারা স্বাধীনও নয়

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে স্বাধীন ও অনর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?" (কিয়ামাহ ঃ ৩৬)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে না?" (মুমিনূন ঃ ১১৫)

জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

"তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করার জন্য যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।" (মুলক ঃ ২)

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

"তোমরা কেমন কর্ম কর, তা দেখবার জন্য অতঃপর আমি তোমাদেরকে তাদের পরে উত্তরসূরী করেছি।" (ইউনুস ঃ ১৪)

পৃথিবীর সাজসজ্জা মানুষকে পরীক্ষার জন্য

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

"তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করার জন্য আমি পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, তাকে সৌন্দর্যস্বরূপ করেছি।" (কাহাফ ঃ ৭)

মানুষ সৃষ্টির সেরা

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"নিশ্চয়ই আমি আদমসন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে জল-স্থলে আরোহন করিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র খাবার দান করেছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।" (তীন ঃ ৪)

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন—আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।" (বাকারা ঃ ৩০)

পৃথিবীর সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট আমানত

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদে ভারপ্রাপ্ত করেছেন, তা থেকে তোমরা ব্যয় করো।" (হাদীদ ঃ ৭)

পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا -

"আল্লাহ তিনি ; যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (বাকারা ঃ ২৯)

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝

"আমি মানুষ ও জিনকে শুধুমাত্র এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট কোন রিযিক চাই না। তেমনি এ–ও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।" (যারিয়াত ঃ ৫৫–৫৬)

আল্লাহর নেয়ামত মানুষের ব্যবহারের জন্য

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সজ্জাসামগ্রী ও পবিত্র রিযিকসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করল? বলুন—এতো পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কেয়ামতের দিন তাদেরই জন্য নির্ধারিত।" (আরাফ ঃ ৩২)

পানাহারে কোন দোষ নেই, অপচয় দোষণীয়

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"তোমরা পানাহার করো, তবে অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।" (আরাফ ঃ ৩১)

গোটা মানব একই গোত্রের ।। পারস্পরিক প্রাধান্য শুধুমাত্র তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

"হে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে সম্প্রদায় ও গোত্র করেছি। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তিই আমার নিকট সবচেয়ে মর্যাদার পাত্র।" (হুজুরাত ঃ ১৩)

দ্বিতীয় জীবন

এ জীবনের পর আরেকটি জীবন রয়েছে।। সেখানে পার্থিব কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং প্রতিটি বিন্দুর হিসাব হবে

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

"নিশ্চয় আমার নিকট তাদের ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আমার।" (গাশিয়া ঃ ২৫-২৬)

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَّعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اِنَّهٗ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ

"তার নিকট তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এ হচ্ছে আল্লাহর সত্য অঙ্গীকার। তিনি সৃষ্টি শুরু করেন। অতঃপর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দেয়ার জন্য পুনরুজ্জীবিত করেন।" (ইউনুস ঃ ৪)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

"কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতএব কারো সাথে মোটেই অবিচার করা হবে না। একটি শস্যদানা পরিমাণ হলেও আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাবের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (আম্বিয়া ঃ ৪৭)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

(যিলযাল ঃ ৭–৮)

পার্থিব জীবন গৌণ ও ক্ষণস্থায়ী, পরকালের জীবন চিরস্থায়ী

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"পার্থিব এ জীবন খেলতামাশা বৈ নয়, পরকালই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!" (আনকাবুত ঃ ৬৪)

পরকালের সাফল্য সৎলোকদের, যারা পার্থিব জীবনে নিজেদের অকল্যাণ ও অনিষ্ট চায় না

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"ঐ পরকালের আবাস আমি তাদেরকে দেব ; যারা পৃথিবীতে অহংকার ও বিপর্যয় চায় না। মুত্তাকীদের জন্যই চূড়ান্ত পরিণতি।" (কাসাস ঃ ৮৩)

আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার ফল ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

স্রষ্টা, সৃষ্টি, জীবন, মানুষ, তার পরিণতি ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে তত্ত্ব ও মূলনীতি বর্ণনা করা হলো, তা আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে মানব জাতি অর্জন করেছে। এই তাত্ত্বিক, মানসিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর জীবনের যে ইমারত নির্মিত হয়, তার রূপরেখা ও বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন নয়। একটি বীজ দেখে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বলে দিতে পারেন, এ থেকে কি গাছ উৎপন্ন হবে, তার পাতাগুলো কেমন হবে এবং তাতে কি ফল ফলবে। আবার একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক সে গাছের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিক্রিয়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন। তেমনি এ জগত, এর ব্যবস্থাপনা, এর আদি-অন্ত, জীবনের উদ্দেশ্য, মানবিক পদমর্যাদা এবং এ জাতীয় অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে কোন বিশেষ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের অপরাপর অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে—যাঁরা এগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁরা সহজেই এ কৃষ্টির বিস্তারিত রূপরেখা পেশ করতে পারেন।

ইন্দ্রিয় নির্ভর, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রত্যক্ষণবাদী এবং ঐশ্বরিক শিক্ষা ও কৃষ্টির ভিত্তি ও মূলনীতির মধ্যে যে পারস্পরিক বৈপরিত্য রয়েছে, সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। এই বৈপরিত্য যেমন মূলনীতিতে, তেমনি ব্যাখ্যায়ও বিদ্যমান। আমের বীজ ও রসের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এর পাতা ও ফলের মধ্যে রয়েছে। গাছের বৃদ্ধি, বিস্তৃতি ও পুরাতন হওয়ার কারণে এ পার্থক্য দূর হয় না। আপনি যদি এরূপ মৌলিক পরস্পর বিরোধী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখতে পান, তাহলে বুঝবেন—হয়ত আপনি এর মূলনীতি ও ভিত্তি নির্ধারণে ভুল করেছেন অথবা এ কৃষ্টিতে অন্য কোন জীবন বৃক্ষের কলম বাঁধা হয়েছে। এ ধরনের যৌক্তিক বৃক্ষ দু' ধরনের ফল দিতে পারে। স্বয়ং ঐশ্বরিক কৃষ্টিতে অনেক বার ইন্দ্রিয় নির্ভর বা প্রত্যক্ষণবাদী কৃষ্টির তালি যুক্ত করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে একাধিকবার এ ঘটনা ঘটেছে। খেলাফতে রাশেদার পর এ বৃক্ষে কখনো আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত, কখনো অনারবের রাজতন্ত্র, আবার

কখনো বা গ্রীক ও পারসিক প্রত্যক্ষণবাদ এবং কখনো বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার কলম বাঁধা হয়েছে। এই যৌগিক বৃক্ষকে সাধারণভাবে ইসলামী কৃষ্টি ও ইসলামী সভ্যতা নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং এরই ফল নিয়ে আমাদের কোন কোন মুসলিম লেখক ও ঐতিহাসিক গর্ববোধ করেন। ইসলামী কৃষ্টি শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মন ধাবিত হয় দামেশক ও বাগদাদ, কর্ডোভা ও গ্রানাডা, ইস্পাহান ও সমরখন্দ এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর প্রতি। আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠে এক বিশেষ ধরনের নির্মাণশৈলী (যা ইসলামী স্থাপত্য বিদ্যা নামে পরিচিত) যার নিদর্শন হলো বাদশাহগণের জমকালো প্রাসাদ, সুদৃশ্য অট্টালিকা, প্রশস্ত দেউড়ি এবং বিরল স্মৃতি সৌধ এভাবে মুসলমানদের সুরুচি ও সজীব হৃদয়ের বিভিন্ন নিদর্শন, সূক্ষ্মতর শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নগর ও রাজধানীর স্বাধীন বিলাস জীবনের দৃশ্য ফুটে উঠে। অথচ এগুলোর অনেক কিছুই মুসলমান বাদশাহগণের অনর্থক অপচয়, ইসলামের মূলনীতি ও বিধান থেকে বিচ্যুতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃতির স্বাক্ষর বহন করে। (তাঁরা শরীয়তের বিধান মেনে চললে) এগুলোর অস্তিত্ব আসতো না এবং যদি কখনো ইসলামী কৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রাণশক্তি নিয়ে পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নিছক বিলাসিতা ও প্রসিদ্ধির জন্য বা জাঁকজমক ও আড়ম্বর প্রকাশের জন্য অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ ইসলামে পছন্দনীয় নয়। স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা একেবারেই অনৈসলামী কাজ ও অপব্যয়। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। একজন মানুষ মৃত্যুর পরেও একটি বিরাট ভূখণ্ড অনর্থক দখল করে রাখবে এবং তাঁর স্মৃতিসৌধের ইট, দেয়াল ও তার সাজ সজ্জায় এ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে, যা দ্বারা হাজার হাজার মানুষের মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা হতে পারে, ইসলাম তা কখনই স্বীকার করে না। খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেক আমল, নেক সন্তান ও সদকায়ে জারিয়া ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পৃথিবীতে নিজ নাম স্মরণীয় রাখবার চেষ্টা করা জাহেলিয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

তেমনি সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহ দানের পরিবর্তে যদি বলা হয়, ইসলামে এর প্রতি নিরুৎসাহিত করেছে, তাহলেই সঠিক হবে। চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ

ইসলামী শরীয়তে হারাম। রেশমী পোশাক ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য অবৈধ, স্বর্ণ রূপার পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যেসব বস্তু মানুষের জীবনে আলসেমী, দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ ও বিলাসিতা সৃষ্টি করে, ইসলামী কৃষ্টিতে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং এগুলোকে সুনজরে দেখা হয়নি।

হাদীসে আছে—

إِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

'আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বিলাসী নন।'

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী কৃষ্টি ও ইসলামী সভ্যতা বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের অনেক মুসলিম লেখক ও ঐতিহাসিক যা নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং তাঁরা এটিকে আধুনিক পাশ্চাত্য কৃষ্টির মোকাবেলায় উপস্থাপন করে বিজয়ী সুলভ আনন্দ অনুভব করেন, তা হচ্ছে মুসলিম রাজা বাদশাহ এবং মুসলমান নামধারী সম্প্রদায়ের জীবন পদ্ধতি। ইসলামের সাথে এর এতটুকু সম্পর্ক যে, এর প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং ইসলামের অনেক অনুশাসন মেনে চলে।

কিন্তু এই তালি লাগানোর ঘটনা যদি না ঘটে এবং দু' প্রজাতির দুটি গাছকে ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠবার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে এ দুটো কখনো একীভূত হয়ে যেতে পারে না। এদের মধ্যে শুধুমাত্র এদিক দিয়ে মিল থাকবে যে, দুটিই গাছ এবং একই ভূমিতে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি উভয় কৃষ্টির মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য এবং সে দুটির প্রতিনিধিদের মধ্যে (যদি তারা কৃষ্টির প্রাণশক্তি ধারণ করে) যুক্তিবিদ্যা সম্মত সংজ্ঞা (যে তারা বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী) ব্যতীত অন্য কোন দিক দিয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তদুপরি উভয়ের সুস্থতার নিয়ম, অগ্রগতির উপায় এবং সহযোগী পরস্পর বিভিন্ন, কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী হবে। ঐশ্বরিক কৃষ্টির যা অগ্রগতি ও উন্নতির উপায়, ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুবাদী কৃষ্টির জন্যে তা ধ্বংস ও অবনতির কারণ। বস্তুবাদী কৃষ্টির জন্যে যা গর্বের বিষয় ঐশ্বরিক কৃষ্টিতে তা নিন্দা ও অপছন্দের বিষয়। একটির জন্যে বসন্তকাল, অপরটির পক্ষে তা হচ্ছে মারাত্মক বিষ।

এখন এই ঐশ্বরিক কৃষ্টির উপাদানসমূহকে বিশ্লেষণ করে দেখুন এতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তি এবং তার নৈতিকতা ও সমাজের উপর কী বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ কৃষ্টি সর্বপ্রথম এ জগত সম্পর্কে মেনে নেয় যে, এটি কোন নৈরাজ্য নয়, আবার একাধিক শাসকের যৌথ রাজত্বও নয়। বরং এর মালিক একজনই, যিনি এর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। ব্যবস্থাপক ও শাসক। সৃষ্টি তার, রাজত্বও তাঁর,বিধানও তাঁরই। এ জগতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাঁরই কুদরতে হয়। মৌলিক কারণ তাঁর ইচ্ছা ও কুদরত। গোটা সৃষ্টিকুল পরিচলনের দিক দিয়ে তাঁর সামনে অবনত এবং তাঁর বিধানের অনুগত। অতএব ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিরও উচিত, তাঁর সামনে মাথা নত করা।

সর্বপ্রথম এই হয় এর মানসিক প্রতিক্রিয়া। গোটা বিশ্ব জগতে একটি কেন্দ্রিকতা ও শৃংখলা, জগতের দৃশ্যতঃ বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে একটি সম্পর্ক এবং নিয়মাবলীর মধ্যে এক ধরনের ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয়, মানুষ তার জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং সৃষ্টিকুল সম্পর্কে তার চিন্তাধারা ও মনোভাব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।*

---

* দর্শনও ধর্মের এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া মেনে নেয় এবং এ ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে। আধুনিক দর্শনের জার্মান ঐতিহাসিক ডঃ হেরাল্ড হফডিং লিখছেন ঃ "যে কোন একত্ববাদী ধর্মের মূল চিন্তাধারা এই হয় যে, সকল বস্তুর পিছনে একটি মাত্র কারণ রয়েছে। এ ধারণা থেকে অপরিহার্যরূপে যেসব প্রশ্ন সৃষ্টি হয় সেসব এড়িয়ে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া মানবীয় প্রকৃতিতে এই হয় যে, সকল প্রকার বৈসাদৃশ্য ও বিস্তৃতি থেকে নজর এড়িয়ে তারা একটি বিধানের সাথে জগতের সব কিছুকে সম্পৃক্ত ও সংহত মনে করতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। কারণ এক হওয়ার ফলে বিধানও এক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। এতে অসভ্য মানুষেরা ধর্মের আধিক্যের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ত এবং সংখ্যাধিক্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। সাথে সাথে একত্ববাদের ধারণা মানুষকে সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। কেননা সকল বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা হলো দৃশ্যমান বস্তুর ব্যাখ্যা যথাসম্ভব স্বল্প মূলনীতি দ্বারা করতে হবে। তথাপি তাকে স্বীকার করতে হয় যে, কোন একটি সর্বোচ্চ বিধানের ধারণা একটি সুদূর পরাহত লক্ষ্য।" (তারীখে জাদীদ ফালসাফা ৫)

নৈতিকতা ও কর্মের উপর এর প্রভাব আরো গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক। তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং আল্লাহর রাজ্যে স্বৈরশাসনের মনোভাব (যা সকল বিশৃংখলা–বিপর্যয় ও বিবাদ–বিসংবাদের মূল উৎস) দূরীভূত হয়ে যায়। সে এ পৃথিবীর বাসিন্দাদেরকে, ধন ভাণ্ডারকে এবং স্বয়ং নিজ শক্তি সামর্থ্য ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে নিজ সম্পত্তি ভাবে না ; বরং আল্লাহর আমানত মনে করে এবং তাঁর অনুমতি ও বিধানের পরিপন্থী উপায়ে তা ব্যবহার বা তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে ভয় পায়। সে নিজ অপেক্ষা উঁচু স্তরের এক শক্তির অধীনে নিজেকে আজ্ঞাবহ এবং একটি উঁচু আদালতে নিজেকে আসামী মনে করে। এ বিশ্বাস ও মনোভাব নৈতিকতা ও কর্মের ক্ষেত্রসমূহ এবং জীবনের বিস্তারিত প্রেক্ষিতে কি প্রভাব ফেলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

জীবন ও জগত উদ্দেশ্যমূলক এবং মানুষ পূর্ণ স্বাধীন নয়— এ বিশ্বাস তার দায়িত্বের অনুভূতি এবং জীবনের সঠিক মূল্য অনুধাবনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। তার নিকট জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং নিজের প্রতিটি শ্বাস অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়। সে এগুলোকে অনর্থক ব্যয় করতে চায় না। কিন্তু এর মূল্য তারা এজন্য দেয়না যে, তারা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের জন্য জীবনের কোন মুহূর্ত নষ্ট করবে না। বরং মৃত্যুর পরে যে চিরস্থায়ী জীবন আসবে, তার জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রী সংগ্রহ করতেই তারা প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করে ও কাজে লাগায়।

তারা জীবন এবং পৃথিবীর সুখ সামগ্রী ও সাজ–সজ্জাকে পরীক্ষার সামগ্রী বলে মনে করে। তাই তারা পৃথিবীকে একটি প্রশস্ত বিনোদন কেন্দ্র এবং জীবনকে একটি দীর্ঘ অবকাশ কাল না ভেবে পৃথিবীকে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র মনে করেই পদক্ষেপ নেয়। তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় চিন্তা–ভাবনার পর। সে প্রতিটি কাজ দেখে শুনেই করে। সে কখনও অসাবধান ও আত্মভোলা হয় না।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে হযরত ওমরের (রাঃ) প্রশংসা করতে অনুরোধ জানালে তিনি বলেন—

"তিনি (ওমর) সর্বদা এমন ভীত ও সাবধান পাখির মত থাকেন—যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যে কোন রাস্তায় তার জন্যে জাল পাতা রয়েছে।

এ জীবন গৌণ ও নশ্বর এবং মৃত্যুর পরের জীবন চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর হবার বিশ্বাস পৃথিবীকে সকল আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্র হবার পথেও বাধা সৃষ্টি করে। সে জন্যে এ জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি, বস্তু ও কর্ম সম্পর্কে জীবনের বস্তুগত দৃষ্টিকোণ,নৈতিকতার পার্থিব মর্যাদা তার দৃষ্টিতে মূখ্য ও স্থায়ী বলে গণ্য হয় না। তার জন্যে বস্তুরাজি ও নৈতিকতার মান নির্ণয় ও মূল্যায়নের জন্যে ভিন্নতর মানদণ্ড ও মাপকাঠি হয়ে থাকে। আর তা হলো তার দ্বীনী উপকারিতা ও পরলৌকিক প্রতিদান।*

তারা এ দুনিয়ার ভোগ–বিলাসের প্রতি কখনই আত্মনিয়োগ করে না, জীবনকে অধিকতর আনন্দময় ও স্বচ্ছন্দ করার জন্যে তাদের মধ্যে কখনই প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টি হয় না (যা সকল অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক অনিষ্টের মূল কারণ) তারা রাজত্বের মধ্যেও এমন বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করে, দুনিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং যাযাবর বৈরাগীও যার নজির পেশ করতে পারে না। আপনারা হযরত ওমরের সংসার বিমুখতার ঘটনা শুনে থাকবেন। কোন আড়ম্বরের খাদ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলতেন—

আমার ভয় হয়, কেয়ামতের দিন আমাকে বলা হয় কিনা—

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ـ

"তোমরা সকল আস্বাদ দুনিয়াতেই গ্রহণ করেছো ও তার আনন্দ উপভোগ করেছো।"

---

* মানুষের কর্ম ও চরিত্রে এ বিশ্বাসের যে প্রভাব পড়ে, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে বস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। 'তারীখে আখলাকে ইউরোপ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"মানুষ যদি সত্যিই মনে করে যে, তার নিজ কর্মের বিনিময় চিরস্থায়ী শাস্তি বা চিরস্থায়ী শাস্তির আকারে কোন সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ বিচারকের আদালতে পাওয়া যাবে, তাহলে এ ধারণা সৎকাজের পক্ষে এমন এক শক্তিশালী উদ্দীপক হবে, যার সামনে অন্যায় কাজের কোন অজুহাত চলতে পারে না।"

কেউ কোন সুস্বাদু খাবার পেশ করলে তিনি প্রশ্ন করতেন—সব মুসলমান কি এটি খেয়ে থাকে বা খেতে পারে? নেতিবাচক উত্তর হলে, তিনি তাতে হাত লাগাতেন না।

বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রাজকীয় ও বিজয়ীর বেশে তিনি যে সফর করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দুজনের আরোহণের জন্যেএকটি মাত্র উট। মাথা ঢাকবার কিছু নেই। উটের পিঠের জিনই রাতের বিছানা, মালপত্রের বোঝাই মাথার বালিশ। পরিহিত জামার পার্শ্বদেশ ছেঁড়া—এমন বেশে যিনি সফর করছেন, তিনি সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একদিন হযরত আলী (রাঃ)-এর জনৈক সাথী জিরার ইবনে জমরাকে বলেছিলেন—আলীর (রাঃ) অবস্থা বর্ণনা কর। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পীড়াপীড়ি করলে তিনি যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটি বাক্য আপনাদের সামনে পেশ করছি। এ থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারবেন—খেলাফত ও প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও তাঁরা কিরূপ জীবন যাপন করতেন।

> "তাঁর নিকট দুনিয়া এবং এর জাঁকজমক ও আড়ম্বর ছিল বিতৃষ্ণার বিষয়। রাতেই তাঁর মনে স্বস্তি আসতো। তাঁর চোখ থাকতো পানিতে পূর্ণ। তিনি সর্বদা ভাবনা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, তিনি মোটা কাপড় পছন্দ করতেন এবং সাদাসিধে সাধারণ খাবার ভালবাসতেন। তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতই থাকতেন। আমাদের ও তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝা যেতো না। আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জবাব দিতেন। আমরা তাঁর সামনে এলে তিনিই প্রথমে সালাম দিতেন। আমরা আহ্বান করলে কোনরূপ ভনিতা না করেই তিনি তাতে সাড়া দিতেন। কিন্তু এ নৈকট্য ও তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁর মজলিসে এমন গাম্ভীর্য বিরাজ করতো যে, আমরা পরস্পর আলাপ করতে পারতাম না এবং নিজেরা কোন কথা শুরু করতে পারতাম না। তিনি দ্বীনদারদের সম্মান করতেন। দরিদ্রদের ভালবাসতেন। কোন শক্তিধর ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে অন্যায় কিছু

হাসিল করার আশা করতো না। দুর্বল ব্যক্তি তাঁর ন্যায় বিচার সম্পর্কে নিরাশ হতো না। আল্লাহর শপথ! আমি অনেকবার দেখছি, রাতের অন্ধকারে তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। দাড়ি ধরে সাপে দংশিত ব্যক্তির মত ছটফট করছেন এবং এমন কাঁদছেন যেন তাঁর বুকে আঘাত লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি বলছেন—রে দুনিয়া, রে দুনিয়া, তুই কি আমাকে ভোলাতে চাস? আমার উপর কি তোর দৃষ্টি পড়েছে? তুই সে আশা ছেড়ে দে। অন্য কাউকে ধোকা দে। আমি তোকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেছি যে, কখনই তোর নাম উচ্চারণ করবো না। তোর জীবন সংক্ষিপ্ত। তোর জীবন মূল্যহীন। কিন্তু তোর বিপদ অনেক বেশী। হায়! সফরের পাথেয় কত স্বল্প! সফর কত দূরের। রাস্তা দুর্গম! (ইবনুল জওযী, সিফাতুস সাফওয়া ১খ. ১২২)

পরকালে বিশ্বাস, হিসাবের ভয় ও খোদাভীতির ফলে এমন দায়িত্বানুভূতি ও সতর্কতা সৃষ্টি হয়; যা ধারণা করাও কঠিন। নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তার কিছুটা অনুমান করা যাবে ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন—আমার খেলাফত ও শাসন ক্ষমতার স্বরূপ হলো—তিনজন ব্যক্তি সফরে রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনের নিকট যাবতীয় খরচপত্র বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সবকিছুর ব্যবস্থা করে নেয়ার দায়িত্ব দিল। কখনো কখনো তিনি বলতেন—আমার দৃষ্টান্ত এতিমের অভিভাবকের ন্যায়। সচ্ছলতা থাকলে সে নিজের থেকে আহার করবে, আর অভাব থাকলে এতিমের সম্পদ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ নিতে পারবে।

একবার তিনি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সদকার উটের গায়ে তেল লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ বলল, কোন গোলামকে বললে হত! তিনি বললেন, "আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে।"

তিনি বলতেন, ফোরাতের তীরে যদি একটি ছাগলছানা মারা যায়; তাহলেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এমন সতর্ক ছিলেন যে, তিনি সাধারণ বাবুর্চিখানায় গরম করা পানি ব্যবহার করতেন না। কেননা তা

বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হত এবং তাতে সাধারণ মুসলমানের হক ছিল। কখনও নেহায়েত অগত্যাবশতঃ সেখানকার পানি ব্যবহার করলে তিনি সেজন্য ব্যয় বহন করতেন। সরকারী কাজের জন্য যে বাতি জ্বলত তার আলোতে তিনি ব্যক্তিগত কাজ করতেন না। কেউ ব্যক্তিগত আলাপ শুরু করে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাতি নিভিয়ে দিতেন এবং নিজস্ব বাতি চেয়ে নিতেন।

তিনি ছিলেন সমকালীন বিশ্বে সবচেয়ে বেশী শাসন ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, সাসানী সাম্রাজ্য ও নতুন ইসলামী সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন একক অধিপতি। তা সত্ত্বেও তার খরচের মাত্রা ছিল এই যে, একবার তিনি নিজ কন্যাদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলেন—তারা প্রত্যেকে কথা বলার সময় মুখে হাত দিয়ে রাখছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে তাদের পরিচারিকা বলল, আজ ঘরে মসুরের ডাল ও রসুন ব্যতীত অন্য কোন খাবার ছিল না। মেয়েরা তা-ই খেয়েছে। দুর্গন্ধে আপনার কষ্ট হবে—এ আশংকায় তারা মুখে হাত রেখে কথা বলছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এ কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন—কন্যারা আমার, তোমরা রকমারি খাবার খাবে আর তোমাদের পিতাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে—এতে তোমাদের কোন লাভ আছে কি? ছোট্ট মেয়েরাও এ কথা শুনে কাঁদতে লাগল।

এভাবে মানুষের মধ্যে ভদ্রতা ও মহত্ত্বের এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে, সে জীবজন্তুর স্তরে নেমে আসতে কোন মতেই রাজি হয় না এবং অন্য মানুষদের সাথে জীবজন্তু বা জড় পদার্থের মত আচরণ করতে তার মনে সায় দেয় না। নিজের ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রভাব সৃষ্টির জন্য সে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা বৈধ মনে করে না। সে নিজের ও মানব সম্প্রদায়ের অন্য সদস্যদের মধ্যে এমন কোন স্বাতন্ত্র্য দেখতে পায় না, যাতে সে তাদেরকে অপদস্থ বা নিগৃহীত করবার অধিকার রাখে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) তখন মিসরের গভর্নর। সেখানে একবার ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। জনৈক মিসরী বলল, আল্লাহর শপথ! আমার ঘোড়া এগিয়ে আছে। আমর ইবনুল

আস (রাঃ)–এর জনৈক পুত্র লোকটিকে চড় মেরে বসলেন এবং বললেন—এই নাও! সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক ছেলের চড়। লোকটি হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট গিয়ে অভিযোগ পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) অবিলম্বে আমর ইবনুল আস (রাঃ)কে ছেলেসহ ডেকে পাঠালেন। তারা এসে পৌঁছুলে তিনি মিসরী লোকটিকে বললেন, এই ছড়িটি দিয়ে সম্ভ্রান্ত ছেলেটিকে মার। সে আমর ইবনুল আস (রাঃ)–এর ছেলেকে এমনভাবে মারল যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এবার তুমি ছড়িটি আমর ইবনুল আস–এর মাথার উপর ঘুরাও। কেননা তার পুত্র তোমাকে যে চড় মেরেছে তার একমাত্র কারণ পিতার ক্ষমতার দর্প। অতঃপর তিনি আমর (রাঃ)কে বললেন—

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارًا

মানুষেরা তো স্বাধীন হয়ে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তুমি তাদেরকে কবে থেকে গোলাম বানালে?

আমার জানা মতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরো ইতিহাসে এটিই ছিল একমাত্র খাঁটি, ন্যায়–নীতিসঙ্গত সমাজ, যাতে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি ধনসম্পদ, পদমর্যাদা বা বংশ পরিচয় ছিল না ; বরং নৈতিকতা, দ্বীনদারী ও খোদাভীতির দ্বারাই কারো মর্যাদা নির্ণীত হতো। এতে বেশভূষা এবং বাহ্যিক ও আপেক্ষিক বস্তুর ভিত্তিতে সম্মান ও প্রভাব অর্জিত হতো না ; বরং ঈমান, সৎকাজ ও সচ্চরিত্রের ভিত্তিতেই সকল মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সাব্যস্ত হতো।

একবার কতিপয় কুরাইশ নেতা ও কতিপয় মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম একই সময়ে হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে দেখা করতে আসে। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ছিলেন সুহাইল ইবনে আমর ও আবু সুফিয়ান। মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদের মধ্যে ছিলেন হযরত সুহাইব ও হযরত বেলাল (রাঃ)। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বের হলেন। তিনি হযরত বেলাল ও সুহাইবকে ভিতরে ডাকলেন। কুরাইশ নেতাগণ বাইরেই রয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর কী মর্জি! সুহাইব ও বেলালকে ভিতরে ডেকে নেয়া হয় আর আমরা বাইরে বসে থাকি। সুহাইল বললেন—বন্ধু, এতে তোমার রাগ হলে তুমি নিজের প্রতি ক্ষোভ

প্রকাশ কর। এটি আমাদেরই। আহ্বানকারী সাধারণ ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঘোষক সবাইকেই ডেকেছিলেন। এরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল আর আমরা বসে ছিলাম। আমরা যেমন সে দাওয়াত (ইসলাম) কবুল করতে বিলম্ব করেছিলাম, তেমনি আজও আমরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকব। কেয়ামতের দিন যখন এদেরকে ডেকে নেয়া হবে আর তোমরা পিছনে থেকে যাবে তখন কেমন হবে!

অতঃপর নেতৃবৃন্দ হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট কথাটি পাড়লেন। বললেন—ত্রুটি তো আমাদেরই হয়েছে। এ কলংক যে চিরকাল থেকে যাবে! কোনরূপে কি এটি মোচন হতে পারে? হযরত ওমর (রাঃ) শামের প্রতি ইংগিত করে বললেন—ওখানে গিয়ে জেহাদ কর। সেমতে তারা শামে চলে গেলেন এবং বাকি জীবন জেহাদেই কাটালেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল মালের অর্থ বন্টনের সময়ও এ নিয়ম বজায় রেখেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ ও এ সেবায় যার ভূমিকা যতটুকু ছিল, বায়তুল মাল থেকে তাঁর প্রাপ্য ছিল সে অনুযায়ী।

শাম সফরের সময় হযরত ওমর (রাঃ)কে উদ্দেশ করে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেছিলেন, এখন সবাই আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে। আপনি আপনার পোশাকটি একটু ঠিক করে নেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন—আবু উবায়দা, আপনার মুখে আমি এরূপ না শুনলেই ভাল হতো। পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে অধিক অপদস্থ ও মর্যাদাহীন কোন জাতি ছিল না। ইসলামের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মর্যাদা দান করেছেন। এখন যদি আপনারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সম্মান প্রার্থনা করেন, তাহলে তিনি আপনাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ইন্তেকালের সময় যাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তারা কেউ জীবিত থাকলে খলীফা হবার যোগ্য ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ)এর মুক্তি প্রদত্ত গোলাম সালেম (রাঃ)।

হযরত বেলাল (রাঃ) এক আনসার পরিবারে নিজ ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ উপলক্ষে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন এভাবে—আমি বেলাল, হাবশী বংশোদ্ভূত ও মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। এই আমার ভাই। আপনাদের

পরিবারে যদি তার বিবাহ হয়, তাহলে 'বিসমিল্লাহ', নইলে 'আল্লাহু আকবার'। চারিদিক থেকে সাড়া এলো—আমরা সর্বান্তঃকরণে মঞ্জুর করলাম। ভাই বলল—এ সময়ে এ সত্য প্রকাশের কি প্রয়োজন ছিল? হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন—এ সত্যবাদিতার ফলেই তোমার বিবাহ হলো।

ইন্দ্রিয়নির্ভর ও জাহেলী কৃষ্টির বিপরীতে এ কৃষ্টির ভিত্তি হলো খাঁটি নীতি–বিশ্বাস ও মূলনীতি। এতে জনস্বার্থ ও জরুরী পরিস্থিতির নামে মূলনীতি বর্জন করা বিদ্রোহের শামিল। এ ধর্মের অনুসারী এবং এ কৃষ্টির প্রতিনিধিগণ পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সৈনিক হয়ে থাকেন। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কোন অবস্থায়ই সত্য ও ন্যায়ের আঁচল তাদের হাত ছাড়া হয় না। সত্যের খাতিরে তারা শত্রু–মিত্র ও আত্মীয়–পরে কোন পার্থক্য করে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদানকারীরূপে দাঁড়িয়ে যাও ; কোন সম্প্রদায়ের বৈরিতা তোমাদেরকে যেন কখনই ন্যায় থেকে বিচ্যুত না করে, তোমরা ন্যায়ের পথে চলবে, এটিই তাকওয়ার নিকটবর্তী, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত রয়েছেন।" (মায়েদা ঃ ৮)

কোন কাজে তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিঃশর্ত ও অসীম নয়। তারা শুধুমাত্র সৎকাজ ও ন্যায়ের পথে পরস্পর সহযোগিতা করে।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ·

"তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরে সহযোগিতা করো। অন্যায় ও অত্যাচারের ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে সাহায্য করো না। (মায়েদা ঃ ২)

এই মানসিকতা ও প্রশিক্ষণের ফল কি দাঁড়িয়েছিল, তা একটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যায়। একদিন নবী করীম (সঃ) বললেন—

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

"তোমার ভাই জালেম হোক বা মজলুম হোক,তাকে সাহায্য করবে।"

আরবের লোকেরা ইসলাম–পূর্ব যুগে এরূপ কথাই শুনতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন তাদের মনোভাব বদলে গেছে। তারা জালেম আর মজলুমকে সমান ভাবতে পারে না। তাই প্রশ্ন উঠলো। প্রশ্ন তোলায় আদবেরও খেলাপ করা হয়নি। তারা বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, সে যদি মজলুম হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে সাহায্য করব কিন্তু সে জালেম হলে আমরা তাকে সাহায্য করব কিভাবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেন—জালেমের সাহায্য হলো তার হাত ধরে রাখবে এবং তাকে জুলুম করতে দেবে না।

সত্য ও ন্যায়ের তোয়াক্কা না করে নিছক গোত্র বা সম্প্রদায় প্রীতির কারণে কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষপাতিত্বকে ইসলামের পরিভাষায় 'আসাবিয়্যাত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি এতই গুরুতর অপরাধ যে, ফকীহগণ এটিকে কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হবার প্রধান কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ দেখা গেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ ইজতেহাদী গ্রন্থ 'কিতাবুল উম্ম'–এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের সঠিক প্রাণশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

> "যে ব্যক্তি কথাবার্তার মাধ্যমে 'আসাবিয়াত' (পক্ষপাতিত্ব) প্রকাশ করে, এর প্রতি আহ্বান জানায় এবং এজন্য দলগঠন করে, যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেও তার সাক্ষ্য পরিহার্য। কেননা সে এমন একটি হারাম কাজ করেছে, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমার জানা মতে, ইসলাম বিশেষজ্ঞদের কারো দ্বিমত নেই। সমস্ত মানুষ আল্লাহর বান্দা। তার দাসত্ব থেকে কেউ মুক্ত নয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র সে–ই হতে পারে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অনুগত। আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মধ্যে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার

পাবার যোগ্য সে-ই, যে মুসলিম মিল্লাতের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকার সাধনকারী। যেমন—খলীফা, বিচারক, আলেম, মুজতাহিদ এবং সকল শ্রেণীর মুসলমানের উপকার সাধনকারী। কেননা এঁদের আমল ও ইবাদত অসংখ্য সাধারণ মুসলমানের আমলের কারণ হয়। অধিক আমলের অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প আমলকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমতা বিধান করেছেন। ইসলাম মানুষের সবচেয়ে বেশী সম্মানের কারণ। অতএব কেউ যদি অন্যকে ভালবাসতে চায়, তাহলে সে যেন তাকে ইসলামের ভিত্তিতে ভালবাসে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বিশেষ হৃদ্যতা পোষণ করে, কিন্তু তাই বলে অন্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করে না বা তাদের প্রতি অন্যায় করে না, তাহলে এটি হবে আত্মীয়তা বজায় রাখা। এটি 'আসাবিয়্যাত' নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই কিছু পছন্দনীয় দিক এবং কিছু অপছন্দনীয় দিক থাকে। সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা দোষণীয় নয়। কিন্তু সাথে সাথে যদি অন্যদের প্রতি অত্যাচার করা হয়, তাদের বংশের নিন্দা করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে দল পাকানো হয় এবং শুধুমাত্র বংশের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হয়, তাহলে তা হবে নিন্দনীয়। অবশ্য অন্য ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ করে এবং তার অন্যায় ও অত্যাচারের কারণে তার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা হয়, তাহলে কোন দোষ নেই। যদি বলা হয় সে অমুক বংশ বা পরিবারের লোক হবার কারণে আমি তাকে ঘৃণা করি বা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি, তাহলে তা হবে খাঁটি 'আসাবিয়্যাত'। এর কারণে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, শরীয়তে এর দলিল আছে কি? জবাবে বলা হবে—আল্লাহ্ তাআলা বলেন— "নিশ্চয় মুমিনরা ভাই ভাই।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন— হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করা এবং আসাবিয়্যাতের মত সর্বজন স্বীকৃত হারাম কাজ করতে থাকা এমন অপরাধ, যাতে মানুষের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়।"

কুরআনের ভাষায় মুসলিম জাতির পরিচয়

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ পরস্পরের সহযোগী ; তারা সৎকাজে আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (তওবা ঃ ৭১)

প্রত্যক্ষণবাদী দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার মত এতে দুনিয়াবিমুখতা, নির্জনবাস ও বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই। একসাথে বা ধীরে ধীরে যেকোন প্রকারেই আত্মহত্যা হারাম। নিজেকে অহেতুক কষ্ট দেয়া ও শরীর পাতন অবৈধ। কুমার জীবন ও সংসার বিরাগ অশোভনীয় কাজ। বনজঙ্গলে বাস করা বা সর্বদা নির্জনবাস অপছন্দনীয়। অস্বাভাবিক সাধনা এবং আত্মহনন, ইবাদত–বন্দেগীতে ভারসাম্যহীনতা—এসবই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। পূর্বে এ আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ

"বলুন, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সাজসরঞ্জাম সৃষ্টি করেছেন তা এবং উপাদেয় খাদ্যসমূহ কে হারাম করেছে?" (আরাফ ঃ ৩২)

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

"তোমরা পানাহার করো এবং অপচয় করো না।" (আরাফ ঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ

"ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।"

لَا صَرُوْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ

"ইসলামে কুমার জীবন সমর্থিত নয়"

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"বিবাহ আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে এড়িয়ে চলে আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) লাগাতার রোযা রাখতেন এবং সারা রাত নামায পড়তেন। মহানবী (সঃ) তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—

فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صُمْ وَافْطِرْ ـ

"তোমার নিকট তোমার শরীরের হক রয়েছে। তোমার নিকট তোমার চোখের হক রয়েছে। তোমার নিকট তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য রয়েছে। রোযা রাখো—রোযা ছাড়াও থাকো।"

মুসলমানদের দু'আ হলো—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো। আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।" (বাকারা ঃ ২০১)

এখানে গিরিগুহায় বসে আল্লাহর নাম জপ করায় কোন পৌরুষ নেই। বরং জীবনের টানাপোড়েন, বাজারের শোরগোল এবং কায়কারবারের ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া পৌরুষের পরিচয়।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ

الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

"সেসব পুরুষ, ব্যবসা বা বেচাকেনা যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ, নামায আদায় ও যাকাত প্রদান থেকে অমনোযোগী করে না। তারা সেদিনটিকে ভয় পায় যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ ওলটপালট করতে থাকবে।" (নূর ঃ ৩৭)

এখানে শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণ ও তার ইবাদতের কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং নামাযের পর জীবিকা উপার্জন এবং পরিশ্রম ও ব্যবসায়ের প্রতিও উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"নামায সম্পন্ন হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।" (জুম'আ ঃ ১০)

বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টির বিপরীতে এতে নৈতিকতা ও সমাজ সম্বন্ধে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত তত্ত্ব, নৈতিকতার কতিপয় স্থির মূলনীতি এবং ভাল ও মন্দের কিছু স্থায়ী মানদণ্ড রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি, অবনতি বা পরিবর্তনের কারণে এতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। যা মন্দ, তা কেয়ামত পর্যন্ত মন্দ থাকবে, যা ভাল তা সর্বকালে ভাল থাকবে। লজ্জা-শরম, ভদ্রতা ও চরিত্র, বিশ্বস্থতা, অঙ্গীকার পালন, সততা, আমানতদারী, সতীত্ব ও পবিত্রতা সকল যুগ ও সকল প্রকারের পরিবেশে পছন্দনীয়, প্রশংসনীয় এবং অপরিহার্য চারিত্রিক গুণাবলী রূপে পরিগণিত হবে। এগুলোর স্বরূপ ও মর্যাদায় কোন পরিবর্তন আসবে না। পক্ষান্তরে এ সবের পরিপন্থী বিষয়গুলো সব জায়গায় সব যুগে নিন্দিত ও অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি এসবের মধ্যে যতই কল্যাণ ও উপকার দেখাক এবং এগুলোর বৈধতা বা কখনো কখনো অপরিহার্য বলে ফতোয়া দিক না কেন—এগুলো নিন্দিত বলেই গণ্য হবে। মানুষের রুচি ও অনুভূতি, তার সংজ্ঞা ও পরিভাষা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিবৃত্তি এগুলোর কোনটিই নৈতিকতার মানদণ্ড হতে পারে না। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই পরিবর্তনশীল। এগুলো অনেক কিছু দ্বারা প্রভাবিতও হয়ে থাকে।

এখানে ভাল–মন্দের মানদণ্ড হলো স্বয়ং বস্তুর প্রকৃতি, যার বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে অহী ও রেসালত।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

"আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই, এটিই সরল দ্বীন।" (রূম ঃ ৩০)

বুদ্ধিবৃত্তিক কৃষ্টি ও দর্শনের যুগে অধিকাংশ জাতি ও সমাজে অলংকারিতা ও কৃত্রিমতা ছেয়ে যায়। বস্তুর স্বরূপ এবং নৈতিকতা ও চরিত্রের পারস্পরিক পার্থক্য অস্বীকার করা হতে থাকে, ভাল–মন্দের পুরাতন মানদণ্ড ও সংজ্ঞাসমূহের ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়। নৈতিকতা ও চরিত্র, সুন্দর–অসুন্দর নিছক আপেক্ষিক বিষয় বলে মনে করা হয়। স্থান–কাল–পাত্র ভেদে এতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এই মানসিকতা গুরুতর নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। কোন জাতির জীবনে এ যুগ এসে গেলে তার ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকে না।

প্রাচীন গ্রীক জাতির ধ্বংসের সময় এরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ইরানে এটি বৈধতা নীতি (সবকিছুকে বৈধ মনে করা)–এর রূপ ধারণ করেছিল। ফলে গোটা কৃষ্টি ও সমাজব্যবস্থা ওলট–পালট হয়ে গিয়েছিল। রোমের ঐতিহাসিকগণ এরই অভিযোগ করে থাকেন। বর্তমান ইউরোপ হুবহু এ অবস্থাই বিরাজ করছে। সেখানে চিন্তাশীল ও সংস্কারপন্থী ব্যক্তিবর্গ অনেক দিন থেকে অশনি সংকেতের আশংকা করছিলেন। কিন্তু কারো কাছেই এর প্রতিকার নেই। এর প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র নবুওয়াতী শিক্ষা ও সংরক্ষিত ধর্ম যা বুদ্ধিবৃত্তি বা অভিজ্ঞতার উপর নৈতিকতার সিদ্ধান্ত ও ভালমন্দের মানদণ্ড ছেড়ে দেয় না ; বরং নিজেই নির্ধারণ করে দেয় এবং নিজেই তার তত্ত্বাবধান করতে থাকে।

তেমনি এ কৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং তাতে অনুপ্রবেশকারী আবর্জনাসমূহ দূর করার সুযোগ থাকে। এর সংস্কার সাধনও সম্ভব হয়।

এখানে ইসলামী কৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ও যাবতীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য গ্রন্থসমূহও যথেষ্ট নয়। এখানে শুধু এর প্রাণশক্তি ও বিশেষ প্রকৃতি উল্লেখ করার সুযোগ ছিল। তা থেকে আপনারা এর স্পিরিট বুঝতে পেরে থাকবেন এবং পূর্বোক্ত সভ্যতাসমূহ ও এই ঐশী সভ্যতার মধ্যেকার মৌলিক ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আপনাদের নিকট পরিস্কার হয়ে থাকবে।

পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট আবেদন রাখবো, আপনাদের মতে যদি বস্তুতান্ত্রিক কৃষ্টি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য হয় এবং তার ফলাফল মানবতা ও নৈতিকতার জন্য অধিক উপকারী হয়, তাহলে তো আমার কিছুই বলার নেই। কেননা এই ভাগ্যবান কৃষ্টি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী আয়তনে কর্তৃত্ব করছে। একটি বিরাট সংখ্যক (সম্ভবতঃ সবচেয়ে অধিক সংখ্যক) মানুষের জন্য এটি চুম্বকের আকর্ষণ রাখা সত্ত্বেও এটিকে পূর্ণ বা আংশিক সংশোধনের বা এটিকে আরো জোরদার করার জন্য বর্তমানে খুব প্রচেষ্টা চলছে। এরজন্য কত জাতি জীবন উৎসর্গ করছে। এরজন্য আপনার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। এ হচ্ছে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র এবং একটি প্রবাহমান স্রোত। আপনার কাজ হলো শুধু তাতে নিজেকে সোপর্দ করা।

কিন্তু আপনার নির্বাচন যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে সেজন্য আপনাকে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আপনাকে স্রোতের প্রতিকূলে চলতে হবে। বরং আপনাকে নদীর স্রোত ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনাকে স্বয়ং সেসব প্রবৃত্তি, চিন্তা-ভাবনা, প্রথা ও অভ্যাস প্রথমেই উৎসর্গ করতে হবে যা শত শত বছর ধরে ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা সংকৃতি ও জীবন ব্যবস্থার অধীনে থাকার কারণে আপনার জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। আপনাকে এই মহান লক্ষ্যের বিনিময়ে অন্যান্য হীন উদ্দেশ্যকে বিদায় জানাতে হবে। আপনাকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যের অনুগামী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এর যেসব অংশ অনুকূল নয় বা সাংঘর্ষিক, সেগুলোকে বিলুপ্ত করতে হবে।

এটিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এ দায়িত্ব একমাত্র আপনার উপর অর্পিত। জীবনের যত রূপরেখা অন্যদের নিকট ছিল, তারা সেগুলোকে বার বার পরীক্ষা করে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র আপনার রূপরেখাটি অবশিষ্ট রয়েছে। এটি

মাত্র একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং পুরোপুরি সফল সাব্যস্ত হয়েছিল। পৃথিবীর পুরনো ধ্বংসপ্রায় ভবন এখন পুনরায় আপনার নব নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছে।

معمار حرم باز بہ تعمیر جہاں خیز
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز
از خواب گراں خیز

"হে মক্কা–মদীনার নির্মাতা, জগত নির্মাণে জেগে উঠুন, গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠুন, গভীর নিদ্রা থেকে জাগুন।"

মনে হচ্ছে আল্লাহ এটি সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ চিরকালের জন্য এ পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দিতে চান না। আপনাদের দ্বারা এ কাজ না হ— অন্যদের হাতে হবে।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ

"তোমরা যদি বিমুখ হও, তাহলে তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)